মাসিক

আল-আবরার

The Monthly AL-ABRAR

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৭, সংখ্যা-০৭

আগস্ট ২০১৮ ইং, জিলহজ ১৪৩৯ হি., শ্রাবণ ১৪২৫ বাং

الأبرار

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

ذی الحجة ١٤٣٩ھ، اغسطس ٢٠١٨م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৪

পবিত্র সুন্নাহ থেকে :

'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪৪....... ৬

দরসে ফিক্বহ :

কোরবানী : ফাজায়েল ও মাসায়েল..................... ৮

মুফতী শাহেদ রহমানী

হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ১৪

ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :.............................. ১৫

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :

খ্রিস্টধর্ম : কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-২............. ১৭

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

তাবলীগ জামা'আতের সংকট ও আমাদের করণীয়.......২৯

শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হালীম বোখারী

জোহর ও আসর নামাযের সঠিক ওয়াক্ত................৩২

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৭....... ৩৫

মুফতী শরীফুল আজম

ভিন্ন চোখে কওমি মাদরাসা-১৮......................... ৪২

মাওলানা কাসেম শরীফ

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৬

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.wordpress.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

ফেতনা : প্রতিরোধে করণীয়

রাসূল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় এ কথা স্পষ্ট যে যুগের প্রবাহ পরিক্রমায় ফেতনা-ফ্যাসাদ ভয়াবহ গতিতে ধেয়ে আসছে। যার কারণে বর্তমান যুগে মুসলমানদের ওপর বয়ে যাচ্ছে এক বিভীষিকাময় ক্রান্তিকাল। কোনো বিভাগ এবং কোনো স্তরই যেন ফেতনা-ফ্যাসাদ থেকে মুক্ত নয়।

ইসলামের ইতিহাসে যে ফেতনাগুলো আপতিত হয়েছে, তার দিকে নজর ফেরালে দেখা যায়, মুসলমানদের মধ্যেই কিছু লোক ইসলামের কিছু কিছু বিষয়ে নিজেদের চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এসব ফেতনা ছড়িয়েছে। এমন নয় যে তারা কোরআন-হাদীস থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। বরং কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে এমন চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, যা ইসলাম সমর্থন করে না এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের চিন্তাধারার পরিপন্থী, উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ মতামতের বিপরীত। এসবকে প্রতিটি যুগেই ফেতনা এবং ফেরকায়ে বাতেলা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন উলামায়ে কেরাম। এসব ফেতনা থেকে উম্মতকে বাঁচানোর জন্য সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি যুগেই উলামায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা রেখেছেন।

ইসলামী খেলাফতের প্রথম যুগে সৃষ্টি হয় মুসাইলামা তথা ভণ্ড নবীর দাবিদারের ফেতনা, মুরতাদ হওয়ার ফেতনা ইত্যাদি। যা ইসলামী খেলাফত কঠোর হস্তে দমন করে। এরপর আরম্ভ হয় খারেজী ফেতনা, রাফেজী ফেতনা। এরা কোরআন-হাদীসের অবিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের মাঝে ফেতনা-ফ্যাসাদ এবং সংঘাত সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করেছে। সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে এসব ফেতনা সম্পর্কে উম্মতকে সচেতন করেন, ফেতনা সৃষ্টিকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, প্রয়োজনে কঠোর হস্তে দমন করেন।

তাবেঈন, তাবেতাবেঈনের যুগে খারেজী, রাফেজী ফেতনার পাশাপাশি সৃষ্টি হয় আরো বহু ফেতনা। কেউ ইসলামের আকীদা বিনষ্টকারী, কেউ আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপব্যাখ্যা দানকারী। জবরিয়া, কাদরিয়া, মুতাযিলা, কাররামিয়া, জাহমিয়া, মুশাব্বিহা ইত্যাদি বাতিল ফিরকাগুলো একেকটি ফেতনা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, সলফে সালেহীন তথা প্রতিটি যুগে ইসলামের কর্ণধারগণ ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি আবির্ভূত ফেতনা ও বাতিল ফেরকা সম্পর্কে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। যখন যে ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সে ফেতনা সম্পর্কে কোরআন-হাদীস এবং যুক্তি দ্বারা মুসলমানদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। প্রয়োজনে তাদের গতিরোধ করতে মাঠে-ময়দানে কাজ করেছেন।

তা থেকে বোঝা যায়, সঠিক ইসলামের প্রচার-প্রসার যেমন প্রতিটি যুগে ইসলামের কর্ণধার উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল, তেমনি যুগে যুগে সৃষ্ট বাতিলের মোকাবেলায়ও তাঁদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত কঠোর।

পরবর্তী সময়ে দ্বীনে এলাহীর ফেতনা, কবরকেন্দ্রিক বিদ'আতী ফেতনা, কাদিয়ানী ফেতনা, সাহাবা দুশমনীর ফেতনা, সলফদের না মানার ফেতনা ইত্যাদি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যুগের উলামায়ে কেরাম এসব ফেতনা দমনেও সর্বাত্মক ত্যাগ উৎসর্গ করেন।

ইসলামের পুরো ইতিহাস পাঠে এ কথাও স্পষ্ট হয় যে এরূপ বিভিন্ন ফেতনায় নিপিষ্ট মুসলিম উম্মাহের যাঁরাই জমহুর তথা ঐক্যবদ্ধ উলামায়ে কেরামের সাথে ছিলেন তাঁরাই একমাত্র হক ও সঠিক পথের যাত্রী ছিলেন। এর বাইরে যারা ছিল তারা বাতিল ফেরকা হিসেবেই চিহ্নিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ، ثَلَاثَ مِرَارٍ،

হে লোক সকল! তোমরা ঐক্যবদ্ধ (উলামায়ে কেরাম)-এর সাথে থাকো এবং ইখতিলাফ থেকে বেঁচে থাকো। এরূপ তিনবার বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ, হা. ২৩১৪৫)

بالجماعة : মুহাদ্দিসীনগণ এর অর্থ করেছেন,

فَالْجَمَاعَةُ الَّتِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِمُلَازَمَتِهِمْ هُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا الْجَمَاعَةُ الْفَسَقَةُ الْجَهَلَةُ

রাসূল (সা.) এখানে যে 'জামা'আত'-এর সাথে থাকার জন্য আদেশ দিয়েছেন তা হলো সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন এবং উলামায়ে কেরামের জামা'আত। ফাসেক এবং জাহেলের জামা'আত নয়। (তাসবীতুল ইমামাতি লিইবনে নাঈম ১/৩৫৭)

এই হাদীস এবং এরূপ অন্যান্য হাদীস থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, জমহুর উলামার বিপক্ষে গিয়ে যারা দল সৃষ্টি করবে, তারা একটি বাতিল ফিরকা হিসেবেই পরিগণিত হবে।

আজ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, দারুল উলূম দেওবন্দের ফরযন্দ হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব তাবলীগ জাম'আত নিয়েও আমাদের কিছু লিখতে হচ্ছে। উলামায়ে দেওবন্দের হাত ধরেই শুরু হয় এই তাবলীগ জামা'আতের পথচলা। তাঁদের দিকনির্দেশনা ও পদাঙ্ক অনুসরণ করাই ছিল এই মহান জামা'আতের মূল চালিকাশক্তি। এর মাধ্যমে সূচনালগ্ন থেকেই তাবলীগ জামা'আতের মেহনতের উপকারিতা, কার্যকারিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিল আকাশচুম্বী। বিশ্বব্যাপী তা ছিল ঐক্যবদ্ধতার এক অনন্য নিদর্শন। সর্বস্থানে উলামায়ে কেরামের তদারকি এবং তাঁদের মেহনতে এই জামা'আত হয়ে ওঠে ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সর্ববৃহৎ একক জামা'আত।

কিন্তু তাবলীগ জামা'আতের নিজামুদ্দীন মারকাজের একজন

মুরব্বি দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন সময় এমন এমন বক্তব্য দিতে থাকেন, যা ইসলামী আকীদা এবং বিধানাবলির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। উলামায়ে কেরাম মনে করেন, মানুষ হিসেবে ভুল হতেই পারে। তাই এই ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম তাঁকে বারবার সতর্ক করেন। কিন্তু তিনি এসব বিষয়ে সতর্ক হওয়া দূরের কথা বরং এসব বিষয়ে আরো কঠোর হতে থাকেন। বলতে লাগলেন জঘন্য বেফাস কথাবার্তা। জনসম্মুখে প্রকাশ করতে লাগলেন কোরআন সুন্নাহর বিপদজনক অপব্যাখ্যা। এই কারণে দারুল উলূম দেওবন্দ আরো সামান্য কঠোরতা দেখিয়ে তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরে একটি ফতোয়া জারি করে। উলামায়ে কেরামের চিন্তা ছিল যদি তিনি ভুলবশত এসব করে থাকেন তবে তা থেকে রুজু করবেন এবং ভুল স্বীকার করে তাওবা করবেন। তাবলীগ জামা'আতকে আকাবীরদের তরীকায় পুনরায় বিন্যস্ত করবেন।

কিন্তু তিনি সেই পথে না গিয়ে নিজের ইসলামবিরোধী বক্তব্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে আরম্ভ করলেন। আকাবীরদের তরীকা থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে নিজেই একটি বাতিল চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করতে উঠেপড়ে লাগলেন। তিনি এককভাবেই বিশ্বব্যাপী উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার দুঃসাহস দেখালেন। অধিকন্তু নিজ চিন্তাধারার ওপর একটি দল গঠন করে স্বয়ং উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে তাদের চালিত করলেন।

উলামায়ে কেরাম তাঁর এসব কার্যক্রমকে কোরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামের ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে দেখে এ কথায় দৃঢ় হলেন যে এটি একটি বাতিল ফিরকা সৃষ্টি এবং মুসলিম উম্মাহকে ফেতনা-ফ্যাসাদে নিপতিত করারই পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং এই ফেতনা দমন করাও উলামায়ে কেরামের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করেন। এই ব্যাপারে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের উলামায়ে কেরাম তো আছেনই বরং সারা বিশ্বের উলামায়ে কেরাম এখন একমত হয়েছেন। সকলের ঐক্যবদ্ধ মত হলো, নিজামুদ্দীন মারকাজ থেকে পরিচালিত তাবলীগ জামা'আত এখন হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

গত ২৮ জুলাই বাংলাদেশে সর্বস্তরের উলামায়ে কেরামের একটি ঐক্যবদ্ধ সমাবেশ থেকেও এ কথা ঘোষণা করা হয়। বিশ্বব্যাপী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়, নিজামুদ্দীনকেন্দ্রিক তাবলীগ জামা'আতের কার্যক্রমকে বাতিল ঘোষণার ক্ষেত্রে সমস্ত উলামায়ে কেরাম এখন একমত। শরয়ী ভাষায় যাকে বলা হয় ইজমায়ে উম্মত।

বাংলাদেশের তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কে গত ২৮ তারিখের উলামা সমাবেশ থেকে ঐক্যবদ্ধ কিছু সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হয়। সিদ্ধান্তগুলো নিম্নরূপ :

"*১. জমহুর উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন তিনটি মৌলিক কারণে– (ক) কোরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা, (খ) তাবলীগের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তাবলীগ ব্যতীত দ্বীনের অন্যান্য মেহনতকে যথা–দ্বীনি শিক্ষা, তাসাউফ ইত্যাদিকে হেয় প্রতিপন্ন করা, (গ) পূর্ববর্তী তিন হযরতজি (হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.), হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ও হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর উসুল ও কর্মপন্থা থেকে সরে যাওয়ার কারণে বর্তমানে মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ সাহেবকে অনুসরণ করা সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয় ও নিষিদ্ধ।*

২. মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ সাহেব হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর রেখে যাওয়া শুরায়ী নিজামকে উপক্ষো করে নিজেই নিজেকে আমির দাবি করেছেন, যা শরীয়তবিরোধী। তাই তাঁর কোনোরূপ সিদ্ধান্ত-ফয়সালা বা নির্দেশ কাকরাইল তথা বাংলাদেশে বাস্তবায়িত করা যাবে না।

৩. দারুল উলূম দেওবন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ সাহেব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতাদর্শ থেকে সরে গিয়ে নতুন কোনো ফেরকা গঠনের অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কোনো জামা'আত বা ব্যক্তিকে নিজামুদ্দীনে পাঠানো বা যাওয়া মুনাসিব হবে না।

অনুরূপভাবে নিজামুদ্দীন থেকে আগত কোনো জামা'আতকে বাংলাদেশের কোনো জেলায়/থানায় ইউনিয়নে কাজ করার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

৪. হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.), হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ও হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর বাতানো পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সারা দুনিয়াতে সমাদৃত ও গৃহীত হয়েছে।

তাই বাংলাদেশের তাবলীগের কাজ পূর্ববর্তী এই তিন হযরতের পদ্ধতিতে এবং উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। নতুন কোনো পদ্ধতি চালু করা যাবে না। কাকরাইল, টঙ্গী ময়দান, জেলা মারকাজসহ সকল মারকাজ এই নীতিতেই পরিচালিত হবে।

৫. কাকরাইল মসজিদের যে সমস্ত শুরা সদস্য আমরণ মাওলানা মুহাম্মদ সা'দ সাহেবের ভ্রান্ত আকীদা অনুসরণের হলফনামা করেছেন, যা শরীয়ত পরিপন্থী। তাঁরা শুরার সদস্য থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন।

অতএব, তাঁদেরকে তাবলীগের কাজে শুরা ও ফায়সাল না রাখার আহ্বান জানানো যাচ্ছে ।

৬. ২০১৮-এ টঙ্গী ইজতেমায় সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে আগামী ২০১৯-এর টঙ্গী ইজতেমার জন্য নির্ধারিত তারিখ-প্রথম পর্ব ১৮, ১৯, ২০ জানুয়ারি ও দ্বিতীয় পর্ব ২৫, ২৬, ২৭ জানুয়ারি এর সাথে আজকের মজমা ঐকমত্য পোষণ করছে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে এবং বর্তমানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বিশৃঙ্খলা রোধে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছে।"

উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের সাথে আমরা একমত। ফেতনার এই ক্রান্তিকালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশ عليكم بالجماعة মতে পুরো মুসলিম উম্মাহ উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকাই সকলের জন্য নিরাপদ। আল্লাহ তা'আলা সকলের সহায় হোন। আমীন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা
২৯/০৭/২০১৮ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ (٦٧) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (٦٨) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٦٩) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٧٠)

(৬৭) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহ্বান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সরল পথেই আছেন। (৬৮) তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন–তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। (৭০) তুমি কি জানো না যে আল্লাহ জানেন, যা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে। এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ। (সূরা হজ)

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমনি শব্দ সহযোগে আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে منسك শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে منسك ও نسك কোরবানীর অর্থে হজের বিধানাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছিল। এ জন্য সেখানে ولكل امة সহকারে واو বলা হয়েছে। এখানে منسك এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ জবেহ করার বিধানাবলি অথবা শরীয়তের বিধানাবলির জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই واو সহকারে বলা হয়নি।

কোনো কোনো কাফির মুসলমানদের সাথে তাদের জবেহ করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করত। তারা বলত, তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক যে, যে জন্তুকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা করো তা তো হালাল এবং যে জন্তুকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মৃত্যু দান করেন, অর্থাৎ সাধারণ মৃত জন্তু তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জবাবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (রূহুল মা'আনী)। অতএব এখানে منسك এর অর্থ হবে জবেহ করার নিয়ম। জবাবের সারমর্ম এই যে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মত ও শরীয়তের জন্য জবেহের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রাসূলে কারীম (সা.)-এর শরীয়ত একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মোকাবেলা কোনো পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েয নয়। অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাতিল চিন্তাধারার দ্বারা এর মোকাবেলা করছ। এটা কিরূপে জায়েয হতে পারে? মৃত জন্তু হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরীয়তের বৈশিষ্ট্য নয়। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথার ওপর ভিত্তি করে পয়গম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতা। (রূহুল মা'আনী)।

সাধারণ তাফসীরকারকদের মতে منسك শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোনো বিশেষ ভালো অথবা মন্দকাজের জন্য নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজের বিধি-বিধানকে مناسك الحج বলা হয়। কেননা এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান, বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য নির্ধারিত আছে। (ইবনে কাসীর)। কামুসে نسك শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ইবাদত। কোরআনে وارنا مناسكنا এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। مناسك বলে ইবাদতের বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই দ্বিতীয় তাফসীরও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তাফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, منسك বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলি বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে মুশরিক ও ইসলামবিদ্বেষীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলি সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা শুনে নিক যে, কোনো পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরীয়ত ও কিতাবের মোকাবেলা করা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোনো উম্মত ও শরীয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরীয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরীয়তের কোনো বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের

বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে মনসূখ তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে নাসেখ তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরীয়তের বাহক তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেওয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য فـــــــلا ينـازعنك فى الامر এর সামর্থ্যও তা-ই। অর্থাৎ বর্তমানকালে যখন শেষ নবী (সা.) একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন তখন তাঁর শরীয়তের বিধি-বিধান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার অধিকার কারো নেই।

এই থেকে আরো জানা গেল যে প্রথম তাফসীর ও দ্বিতীয় তাফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আয়াত জবেহ সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে, অবতরণস্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয় তাফসীরের সারমর্ম এই হবে যে আল্লাহ তা'আলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন, যার মধ্যে বিভিন্নমুখী খুঁটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোনো পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নেই যে নতুন শরীয়ত সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করবে বরং নতুন শরীয়তের অনুসরণ তার ওপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيم অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্ক-বিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না। বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ আপনি সত্য ও সরল পথে আছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের কারণ : উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন বলেছে যে প্রত্যেক শরীয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা স্বয়ং কোরআনই আমাদের এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরীয়ত দেওয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেওয়া হয়েছে যে মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। এ কথা বলা হয়নি যে মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরীয়তের কোনো বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরো ফুটে ওঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দেবেন। وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُون তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন–তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

পরবর্তী আয়াতে একটি উপমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوب

(৭৩) হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো। অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছে থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই শক্তিহীন।

ضرب مثل এই শব্দটি সাধারণত কোনো বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে শিরক ও মূর্তিপূজার বোকামি একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদের তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে করো তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির মতো নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা, তোমরা রোজই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফলমূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও মাছিরা এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছিদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদের বিপদ থেকে কিরূপে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে ضـــعف الـــطـــالـــب والمطلوب বলে তাদের মূর্খতা ও বোকামি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরো বেশি শক্তিহীন হবে। ماقدروا الله حق قدره অর্থাৎ এই নির্বোধরা আল্লাহর মর্যাদা বোঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর অবলম্বনে)

মুসলিম দুনিয়ায় সর্বাধিক পঠিত অন্যতম কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৪৪

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক আল-আবরার। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে নামাযের উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দূ ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে নামায–দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জামা'আত ত্যাগ করার শাস্তি

হাদীস নং-৫।

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، لَا يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلَا جَمَاعَةً؟ فَقَالَ :هُوَ فِى النَّارِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, এক ব্যক্তি সারা দিন রোযা রাখে এবং সারা রাত নফল নামায পড়ে, কিন্তু জুমু'আ ও জামা'আতে শরীক হয় না–তার সম্পর্কে কী বলেন? তিনি উত্তরে বললেন, লোকটি জাহান্নামী।

(তিরমিযী শরীফ ১/৫২ হা. ২১৮, আততারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৬৯ হা. ৬১৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০৪ হা. ৩৪৭৫, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১/৫১৯ হা. ১৯৯০)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

ক. এক হাদীসে বর্ণিত আছে। তিন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তা'আলা লানত বর্ষণ করেন। প্রথমত ওই ব্যক্তি, যার ওপর মুক্তাদীগণ যুক্তিসংগত কারণে নারাজ থাকা সত্ত্বেও সে ইমামতি করে। দ্বিতীয়ত ওই নারী, যার ওপর তার স্বামী নারাজ। তৃতীয়ত ওই ব্যক্তি, যে আযান শুনে জামা'আতে শরীক হয় না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ :لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً :رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ

(তিরমিযী শরীফ ১/৮২ হা. ৩৫৮, মুসনাদুল বাযযার ১৩/২২৩)

হাদীসটি মুরসাল।

হাদীস নং-৬।

وأخرج ابن مردويه عن كعب الحبر قال :والذى أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد أنزلت هذه الآيات فى الصلوات المكتوبات حيث ينادى بهن (يوم يكشف عن ساق) إلى قوله :(وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) الصلوات الخمس إذا نودى بها

وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن سعيد بن جبير فى قوله :(وقد كانوا يدعون إلى السجود) قال :الصلوات فى الجماعات

وأخرج البيهقى عن ابن عباس فى قوله :(وقد كانوا يدعون إلى السجود) قال :الرجل يسمع الأذان فلا يجيب الصلاة

হযরত কা'আব আহবার (রা.) বলেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর ওপর তাওরাত, ঈসা (আ.)-এর ওপর ইঞ্জিল, দাউদ (আ.)-এর ওপর যবুর এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর কোরআন শরীফ নাজিল করেছেন। কোরআনের এই আয়াতসমূহ ফরয নামাযগুলো জামা'আতের সাথে এমনই জায়গায় আদায় করার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যেখানে আযান হয়।

আয়াতসমূহের তরজমা : যেদিন আল্লাহ তা'আলা ছাক-এর তাজাল্লি প্রকাশ করবেন (যা এক বিশেষ ধরনের তাজাল্লি হবে) এবং সকল মানুষকে সিজদার জন্য ডাকা হবে, সেদিন তারা সিজদা করতে পারবে না, তাদের চোখ লজ্জায় অবনত হয়ে

থাকবে, তাদের সর্বাঙ্গে অপমান বিরাজ করবে। কারণ তাদেরকে দুনিয়াতে সিজদার জন্য ডাকা হতো, কিন্তু সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও সিজদা করত না।

(তাফসীরে দূররে মনসূর ৪/২৫৬) এর সাথে উল্লিখিত আরেকটি হাদীস :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ :(وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) (القلم৪৩ :) قَالَ " :الصَّلَوَاتُ فِي الْجَمَاعَاتِ

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/৭৫ হা. ২৯১৪)

হাদীসটির মান : সহীহ

এর সাথে উল্লিখিত আরেকটি হাদীস :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ، وَأَبُو صَادِقٍ الْعَطَّارُ، قَالُوا :حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، قَالَ :فِي قَوْلِهِ :(يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) (القلم৪৩ :) قَالَ: "الرَّجُلُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ فَلَا يُجِيبُ الصَّلَاةَ

(শু'আবুল ঈমান [বায়হাকী] ৩/৭৫ হা. ২৯১৫, দূররে মানসূর [সুয়ূতী] ৮/২৫৬)

হাদীসটির মান : হাসান

ক. হযরত আবু সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট শুনেছি যে এরা ওই সমস্ত লোক, যারা দুনিয়াতে লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ত।

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا

(বোখারী শরীফ২/৭৩১ হা.৪৯১৯, মুসলিম শরীফ ১/১০২ হা. ১৮৩)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

দরসে ফিক্বহ

কোরবানী : ফাজায়েল ও মাসায়েল

মুফতী শাহেদ রহমানী

কোরবানী মুসলিম জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত হিসেবে শরীয়তে মুহাম্মাদীতেও এর বিধান আরোপিত হয়েছে। এটি শা'আইরে ইসলাম তথা ইসলামের প্রতীকী বিধানাবলির একটি।

রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও প্রতিবছর তা আদায় করতেন, হাদীস ও সুন্নাহে উম্মতের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের প্রতি তা আদায়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এর নিয়মনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি রাসূল (সা.) জীবনের সর্বশেষ বছর নিজে ১০০টি উট কোরবানী করেছিলেন।

এতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন।' (সূরা কাউসার : ২)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য উৎসর্গিত। (সূরা আনআম : ১৬২)

আরো রয়েছে আল্লাহর মুহব্বতে নিজের সকল যুক্তি ও চাহিদাকে কোরবানী করা এবং স্বীয় প্রতিপালকের তরে নিজের সব কিছু ত্যাগ করার শিক্ষা।

কোরবানীর ফজীলত

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কোরবানীর দিনসমূহে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোরবানী করার চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো আমল নেই। কোরবানীর পশু কিয়ামতের দিন তার শিং, লোম, খুরসহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে। আর কোরবানীর পশু জবাইয়ের পর রক্ত জমিনে গড়ানোর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে তা কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা এতে আনন্দিত হও। (তিরমিযী, হা. ১৪৯৩)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قُلْنَا :يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ :سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :قُلْنَا :فَمَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ :بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ :فَكُلُّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোরবানী কী জিনিস? উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তা তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত। সাহাবাগণ আরজ করলেন, তাতে আমাদের কী লাভ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কোরবানীর পশুর প্রতিটি লোমের বিনিময় একটি সওয়াব দেওয়া হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ভেড়ার প্রতিটি লোমের বিনিময়েও সওয়াব দেওয়া হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন–হ্যাঁ, ভেড়ার প্রতিটি লোমের বিনিময়েও সওয়াব প্রদান করা হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম ২/৩৮৯)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ :قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِكِ قَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ خَاصَّةً أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ :بَلْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতেমা (রা.)-কে লক্ষ করে বললেন, হে ফাতেমা! তোমার কোরবানীর জন্তুর নিকটে যাও। কেননা

ওই জন্তুর রক্তের প্রথম ফোঁটা বের হতেই তোমার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। ফাতেমা (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই পুরস্কার কি শুধু রাসূল পরিবারের বৈশিষ্ট্য, নাকি সমস্ত মুসলমানের জন্য? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন–না, তা সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (মুসনাদে বায্যার : হা. ১২০২)

অন্য বর্ণনায় হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমার কোরবানীর জন্তুর গোশত, রক্তকে ৭০ গুণ বৃদ্ধি করে তোমার আমলনামার সাথে ওজন করা হবে। (আত্তারগীব, আবুল কাসেম আসবাহানী, হা. ৩৪৮)

হযরত হুসাঈন (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রশান্তচিত্তে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরবানী করল, ওই কোরবানী তার জন্য জাহান্নাম থেকে প্রতিবন্ধক হবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, {আল মু'জামুল কাবীর সূত্রে} ৪/১৭)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ঈদের দিন কোরবানীর খরচের চেয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট অন্য কোনো খরচ বেশি পছন্দনীয় নয়। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ [আল মু'জামুল কাবীর সূত্রে] ৪/১৭)

কোরবানীর মাসায়েল

যাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব :

মাসআলা : যিলহজ মাসের ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের সময় থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সকল প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলিম নর-নারী প্রয়োজনাতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে এবং ওই ব্যক্তি উক্ত তিন দিন সময়ে মুসাফিরও না হয় তার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৩)

মাসআলা : নাবালেগ শিশু-কিশোর ও অসুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি নেসাবের মালিক হলেও তাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, তাদের অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তাদের পক্ষ থেকে নফল কোরবানী করতে পারবে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬)

মাসআলা : যদি নাবালেগ শিশু-কিশোরদের সম্পদ থেকে কোরবানী করা হয় তাহলে তা থেকে কেবল সে-ই খেতে পারবে, অন্য কেউ তা খেতে পারবে না। (আদ্দর্‌রুল মুখতার মাআর রাদ্দিল মুহতার ৬/৩১৭)

মাসআলা : কোরবানীর দিনগুলোতে কেউ মুসাফির হলে (অর্থাৎ ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়্যাতে যে ব্যক্তি নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে) তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয় না। ১২ যিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তে মুকীম হলেও সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ৩/৩৪৪, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৩)

মাসআলা : হাজী সাহেবানদের মধ্যে যারা কোরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবেন, তাঁদের ওপর ঈদুল আযহার কোরবানী ওয়াজিব নয়। কিন্তু যে হাজী কোরবানীর কোনো দিন মুকীম থাকবেন সামর্থ্যবান হলে তাঁর ওপর ঈদুল আযহার কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/২৯৩, আদ্দুররুল মুখতার মাআর রাদ্দিল মুহতার ৬/৩১৫)

মাসআলা : একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তাদের প্রত্যেকের ওপর ভিন্ন ভিন্ন কোরবানী ওয়াজিব হবে। (কিফায়াতুল মুফতী ৮/১৭৮)

কোরবানীর নেসাব :

মাসআলা : কোরবানীর দিনগুলোতে সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি সোনা, সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি রুপা বা ওই পরিমাণ রুপার সমমূল্যের নগদ অর্থ অথবা বর্তমানে বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজন আসে না এমন জমি, প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়ি, ব্যাবসায়িক পণ্য ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্য আসবাবপত্রের মালিক হলে তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে। (মাবসূতে সারাখসী ১২/৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৬৫)

মাসআলা : সোনা বা রুপা কিংবা টাকা-পয়সা এগুলোর কোনো একটি যদি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ না থাকে কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত একাধিক বস্তু মিলে সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার সমমূল্যের হয়ে যায় তাহলেও তার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব। যেমন কারো নিকট কিছু স্বর্ণ ও কিছু টাকা আছে, যা সর্বমোট সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার মূল্যের সমান হয় তাহলে তার ওপরও কোরবানী ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার ৫/২১৯)

স্মর্তব্য যে, কোরবানীর নেসাব পূর্ণ হওয়ার জন্য যাকাতের ন্যায় সম্পদের ওপর বর্ষ অতিক্রম হওয়া শর্ত নয়, শুধু কোরবানীর তিন দিনের মধ্যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়াই যথেষ্ট। এমনকি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণেও নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে গেলে কোরবানী ওয়াজিব হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬২)

মাসআলা : দরিদ্র ব্যক্তি যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় তার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব নয়;

তবে সে কোরবানীর নিয়্যাতে পশু খরিদ করলে ওই পশুটি কোরবানী করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬২)

মাসআলা : কোরবানী সম্পূর্ণ হালাল সম্পদ থেকে করতে হবে। হারাম টাকা দ্বারা কোরবানী করা সহীহ নয় এবং এ ক্ষেত্রে অন্য শরীকদের কোরবানীও সহীহ হবে না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫০৩)

মাসআলা : কোরবানীর পশু চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে ধনী ব্যক্তির আরেকটি পশু কোরবানী করতে হবে। গরিব (যার ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়) হলে তার জন্য আরেকটি কোরবানী করা ওয়াজিব নয়। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯)

মাসআলা : কোরবানীর পশু হারিয়ে যাওয়ার পর যদি আরেকটি কেনা হয় এবং পরে হারানোটিও পাওয়া যায় তাহলে কোরবানীদাতা গরিব (যার ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়) হলে দুটি পশুই কোরবানী করা ওয়াজিব। আর ধনী হলে কোনো একটি কোরবানী করলেই যথেষ্ট। (সুনানে বায়হাকী ৫/২৪৪, কাযীখান ৩/৩৪৭)

কোরবানীতে নিয়্যাত পরিশুদ্ধ করা :

মাসআলা : কোরবানী একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালন করতে হবে। এ ছাড়া লোক-দেখানো বা গোশত খাওয়ার নিয়্যাতে কোরবানী করলে তা সহীহ হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭১)

মাসআলা : অংশীদারি কোরবানীতে কোনো অংশীদারেরও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য নিয়্যাত হলে শরীকদের কারো কোরবানীই সহীহ হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীক নির্বাচন করা জরুরি। (আল বাহরুর রায়েক ৮/২০২)

অন্যজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করা

মাসআলা : অন্যের ওয়াজিব কোরবানী দিতে চাইলে ওই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে, নতুবা ওই ব্যক্তির কোরবানী আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী বা সন্তানের অনুমতি ব্যতীত তাদের পক্ষ থেকে কোরবানী করার নিয়ম সর্বদা থাকে এবং এ ব্যাপারে তাদের জানাশোনা থাকে তাহলে তাদের প্রত্যক্ষ অনুমতি ব্যতীতও কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে অনুমতি নিয়ে করা ভালো। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৫)

মাসআলা : মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত না করে থাকে তাহলে তাদের পক্ষ থেকে নফল কোরবানী করা উত্তম। এর গোশত কোরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো–তা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কোরবানীর ওসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরিব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫২)

মাসআলা : সামর্থ্যবান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে কোরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। আর এ কোরবানীর গোশতের বিধান নিজের কোরবানীর ন্যায় দাতা ও তার পরিবার সকলেই খেতে পারবে। (ফাতাওয়া রশীদিয়া, পৃ. ৫৮৯)

হযরত হানাশ (রহ.) বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে দুটি বকরি কোরবানী করতে দেখে তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ওসিয়ত করেছিলেন যে আমি যেন তাঁর পক্ষ থেকে কোরবানী করি। তাই আমি প্রতিবছর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকেও কোরবানী করে থাকি। (সুনানে আবী দাউদ, হা. ২৭৯০)

মাসআলা : মৃতের পক্ষ থেকে যেমনিভাবে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরবানী করা জায়েয, তদ্রূপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও তার ঈসালে সাওয়াবের জন্য নফল কোরবানী করা জায়েয। এ কোরবানীর গোশত দাতা, তার পরিবারসহ সকলেই খেতে পারবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৭)

মাসআলা : কোরবানীদাতা এক স্থানে আর কোরবানীর পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কোরবানীদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশু যে এলাকায় আছে, ওই এলাকায় ঈদের জামা'আত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮)

কোরবানীর সময় :

মাসআলা : কোরবানীর সময় হলো যিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত মোট তিন দিন। সবচেয়ে উত্তম হলো, প্রথম দিন কোরবানী করা, এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৩; ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/২৯৫)

মাসআলা : যেসব এলাকায় জুমু'আ ও ঈদের নামায ওয়াজিব, সেসব এলাকায় ঈদের নামাযের আগে কোরবানী করা জায়েয নয়। অবশ্য অধিক বৃষ্টি-বাদল বা অন্য কোনো ওজরে যদি প্রথম দিন ঈদের নামায না হয় তাহলে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পর প্রথম দিনেও কোরবানী করা জায়েয

হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৩, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৮)

হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ঈদের দিন আমরা প্রথমে নামায আদায় করি, অতঃপর ফিরে এসে কোরবানী করি। যে ব্যক্তি এভাবে আদায় করবে সে আমাদের নিয়মমতো করল। আর যে নামাযের আগেই পশু জবাই করল, সেটা তার পরিবারের জন্য গোশত হবে, এটা কোরবানী হবে না। (সহীহ বোখারী, হা. ৫৫৪৫)

মাসআলা : ১০ ও ১১ যিলহজ দিবাগত রাতেও কোরবানী করা জায়েয। তবে দিনে কোরবানী করাই উত্তম। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৩, কাযীখান ৩/৩৪৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০)

মাসআলা : কোনো ব্যক্তি কোরবানীর দিনগুলোতে ওয়াজিব কোরবানী আদায় করতে না পারলে কোরবানীর পশু ক্রয় না করে থাকলে তার ওপর কোরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। আর যদি পশু ক্রয় করেছিল, কিন্তু কোনো কারণে কোরবানী দেওয়া হয়নি তাহলে ওই পশু জীবিত সদকা করে দেবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৮, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ৩/৩৪৫)

মাসআলা : খরিদকৃত পশু কোরবানীর দিনগুলোতে জবাই করতে না পারলে তা সদকা করে দেবে। তবে সময়ের পরে জবাই করে ফেললে পুরো গোশত সদকা করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে গোশতের মূল্য যদি জীবিত পশুর চেয়ে কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ মূল্য কমবে তা-ও সদকা করতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৮, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০-৩২১)

যেসব পশু দ্বারা কোরবানী করা যায় :

মাসআলা : গৃহপালিত উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা–এগুলোর নর-মাদি উভয়টি দ্বারাই কোরবানী করা জায়েয। এসব পশু ছাড়া অন্যান্য পশু যেমন–হরিণ, বন্য গরু-গয়াল ইত্যাদি দ্বারা কোরবানী করা জায়েয নয়। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৬৯, কাযীখান ৩/৩৪৮)

মাসআলা : কোরবানীর পশু মোটাতাজা, হৃষ্টপুষ্ট ও নিখুঁত হওয়া উত্তম। (মুসনাদে আহমদ, হা. ১৫৫৩৩)

মাসআলা : খাশীকৃত জন্তু দ্বারা কোরবানী করা জায়েয, বরং উত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা. ৩১১৩)

কোরবানীর পশুর বয়স :

মাসআলা : উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। এর চেয়ে এক দিন কম হলেও কোরবানী হবে না। তবে ৬ মাসোর্ধ্ব ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কোরবানী করা জায়েয। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭০)

উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কোরবানী জায়েয হবে না। (কাযীখান ৩/৩৪৮)

মাসআলা : কোরবানীর পশুর বয়সের হিসাব আরবি বর্ষ হিসেবে ধর্তব্য হবে, এতে ইংরেজি বর্ষ থেকে সাধারণত ১১ দিন কমে বর্ষ পূর্ণ হয়। (কিফায়াতুল মুফতী ৮/২১৭)

শরীকে কোরবানী করা :

মাসআলা : ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কোরবানী দিতে পারবে। এগুলো দ্বারা একাধিক ব্যক্তি মিলে কোরবানী করা সহীহ হবে না। আর উট, গরু ও মহিষে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কোরবানী সহীহ হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭০, কাযীখান ৩/৩৪৯)

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হজ করেছিলাম, তখন আমরা সাতজন করে একটি উট এবং একটি গরুতে শরীক হয়ে কোরবানী করেছি। (সহীহ মুসলিম, হা. ১৩১৮)

মাসআলা : উট, গরু ও মহিষ সাত ভাগে এবং সাতের কমে যেকোনো সংখ্যা যেমন দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ভাগে কোরবানী করা জায়েয। (হিন্দিয়া ৫/৩০৪)

মাসআলা : শরীকে কোরবানী করলে কারো অংশ এক-সপ্তমাংশের কম হতে পারবে না, এমন হলে কোনো শরীকেরই কোরবানী সহীহ হবে না। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭১)

মাসআলা : যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একা কোরবানী দেওয়ার নিয়্যাতে কিনে আর সে ধনী হয় তাহলে তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয হলেও শরীক না করে একা কোরবানী করাই শ্রেয়। শরীক করলে ওই অংশের টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম। আর যদি ওই ব্যক্তি গরিব হয়, যার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব নয়, তাহলে যেহেতু কোরবানীর নিয়্যাতে পশুটি ক্রয় করার মাধ্যমে লোকটি তার পুরোটাই আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে, তাই তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয নয়। যদি শরীক করে তবে ওই টাকা সদকা করে দেওয়া জরুরি। গরিব ব্যক্তি কোরবানীর পশুতে কাউকে

শরীক করতে চাইলে পশু ক্রয়ের সময়ই নিয়্যাত করে নিতে হবে। (হেদায়া ৪/৪৪৩, কাযীখান ৩/৩৫০-৩৫১)

মাসআলা : শরীকে কোরবানী করলে ওজন করে গোশত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়েয নেই। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭, কাযীখান ৩/৩৫১)

দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত পশুর কোরবানী :

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করেছেন বেশি খোঁড়া, অন্ধ, অধিক রুগ্‌ণ, অতিশয় ক্ষীণ দুর্বল পশু দ্বারা কোরবানী করা জায়েয নয়। (জামে তিরমিযী, হা. ১৪৯৭)

হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের আদেশ করেছেন, আমরা যেন কোরবানীর পশুর চোখ ও কান ভালো করে দেখে নিই এবং কানকাটা, কান ছেঁড়া বা কানে গোলাকার ছিদ্র করা পশু দ্বারা কোরবানী না করি। (সুনানে আবী দাউদ, হাদীস : ২৮০৪)

মাসআলা : অতিশয় ক্ষীণ দুর্বল পশু, যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তা দ্বারা কোরবানী করা সহীহ নয়। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/২৯৭)

মাসআলা : যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা এক চোখ পুরো নষ্ট সে পশু দ্বারা কোরবানী করা সহীহ নয়। (কাযীখান ৩/৩৫২, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৫)

মাসআলা : যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এ পরিমাণ দাঁত পড়ে গেছে যে খাদ্য চিবোতে পারে না–এমন পশু দ্বারা কোরবানী করা সহীহ নয়। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৫, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/২৯৮)

মাসআলা : যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙে গেছে, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে পশু দ্বারা কোরবানী জায়েয নয়। পক্ষান্তরে যে পশুর অর্ধেক শিং বা তার চেয়ে কম অংশ ফেটে বা ভেঙে গেছে বা সৃষ্টিগতভাবে শিং একেবারে উঠেইনি সে পশু দ্বারা কোরবানী করা জায়েয। (জামে তিরমিযী ১/২৭৬, সুনানে আবী দাউদ, হা. ৩৮৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৪)

মাসআলা : দুম্বা ব্যতীত অন্যান্য পশুর ক্ষেত্রে লেজ না থাকলে বা কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা হলে সে পশুর কোরবানী জায়েয নয়। আর যদি অর্ধেকের বেশি থাকে তাহলে তার কোরবানী জায়েয। তবে জন্মগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে অসুবিধা নেই। (জামে তিরমিযী ১/২৭৫, কাযীখান ৩/৩৫২, রদ্দুল মুহতার ৫/২০৬)

মাসআলা : কোরবানীর নিয়্যাতে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোনো দোষ দেখা দেয় যে কারণে কোরবানী জায়েয হয় না তাহলে ওই পশুর কোরবানী সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কোরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরিব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কোরবানী করতে পারবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫)

মাসআলা : জবাইয়ের সময় ধস্তাধস্তির কারণে ভালো পশু যদি এমন কোনো ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়, যার দরুন কোরবানী সহীহ হয় না তবুও ধনী-গরিব সকলেই তা দ্বারা কোরবানী করতে পারবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৬)

গর্ভবতী পশুর কোরবানী :

মাসআলা : গর্ভবতী পশু দ্বারা কোরবানী জায়েয, তবে প্রসবের সময় আসন্ন হলে সে পশু কোরবানী করা মাকরূহ। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৯, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ৩/৩৫০)

মাসআলা : জবাইয়ের পর যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সেটাও জবাই করা ওয়াজিব, তা জবাই না করে রেখে দিলে কোরবানীর দিন অতিক্রম হয়ে গেলে তা সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (কাযীখান ৩/৩৫০)

পশু জবাই করার বিধান :

মাসআলা : নিজের কোরবানীর পশু নিজেই জবাই করা উত্তম। নিজে না পারলে অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে কোরবানীদাতা জবাইস্থলে উপস্থিত থাকা ভালো। (মুসনাদে আহমাদ ২২৬৫৭, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৯, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩০০)

মাসআলা : জবাইকারী ও তার সাথে ছুরি ধরায় অংশগ্রহণকারী উভয়েই 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করতে হবে। ইচ্ছাকৃত কেউ বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিলে পশু হালাল হবে না। (আল বাহরুর রায়েক ৮/১৯৩)

মাসআলা : কোনো কোনো সময় জবাইকারীর জবাই সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই বা অন্য কেউ জবাই সম্পন্ন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই উভয়কেই নিজ নিজ জবাইয়ের আগে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে। যদি কোনো একজন না পড়ে তবে ওই কোরবানী সহীহ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৩৪)

মাসআলা : জবাইয়ে পশুর চারটি রগের (শ্বাসনালি, খাদ্যনালি ও দুটি রক্তনালি) মধ্য থেকে তিনটি কাটা আবশ্যক, চারটি কাটাই উত্তম। (আল

বাহরুর রায়েক-৮/১৯৩)

মাসআলা : ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করা উত্তম। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮০)

মাসআলা : জবাইয়ের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা মাকরূহ। জবাইয়ের সময় প্রাণীকে যথাসাধ্য কম কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করা। এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাই না করা। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮০)

মাসআলা : কোরবানীর পশু জবাই করে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়েয। তবে কোরবানীর পশুর কোনো অংশ পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না। (কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৬৫)

মাসআলা : কোরবানীর পশুতে অংশীদার কেউ জবাই করে অন্য শরীকদের থেকে জবাইয়ের পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নেই। (রদ্দুল মুহতার ৫/৩৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫১৮)

কোরবানীর পশু থেকে জবাইয়ের আগে উপকৃত হওয়া :

মাসআলা : কোরবানীর পশু কেনার পর বা নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। যেমন হালচাষ করা, আরোহণ করা, পশম কাটা, দুধ দোহন করা ইত্যাদি। সুতরাং কোরবানীর পশু দ্বারা এসব করা যাবে না, যদি করে তবে পশমের মূল্য, হালচাষের মূল্য ইত্যাদি সদকা করে দেবে। (মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৭৯, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩০০)

মাসআলা : কোরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। যদি জবাইয়ের সময় আসন্ন হয় আর দুধ দোহন না করলে পশুর কষ্ট হবে না বলে মনে হয় তাহলে দোহন করবে না। প্রয়োজনে ওলানে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে, এতে দুধের চাপ কমে যাবে। যদি দুধ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সদকা করে দিতে হবে। নিজে পান করে থাকলে মূল্য সদকা করে দেবে। (মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৯, কাযীখান ৩/৩৫৪, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩০১)

কোরবানীর গোশতের বিধান :

মাসআলা : কোরবানীর গোশতের এক-তৃতীয়াংশ গরিব-মিসকীনকে এবং এক-তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম। অবশ্য পুরো গোশত যদি নিজে রেখে দেয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮১, আল বাহরুর রায়েক ৮/২০৩)

মাসআলা : কোরবানীর গোশত তিন দিনের চেয়ে অধিক সময় রেখে দেওয়া ও খাওয়া জায়েয। (সহীহ মুসলিম ২/১৫৯, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৮, বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮১)

মাসআলা : কোরবানীর গোশত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়েয। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩০০)

মাসআলা : মান্নতকৃত কোরবানীর গোশত নিজে ও পরিবার-পরিজন খেতে পারবে না, বরং তা কোনো মুসলমান ফকীরকে সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২১)

কোরবানীর পশুর অংশ বিক্রয় :

মাসআলা : কোরবানীর পশুর কোনো অংশ যথা–গোশত, চর্বি, হাড্ডি, চামড়া ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রি করলে পূর্ণ মূল্য সদকা করে দিতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮১, কাযীখান ৩/৩৫৪)

মাসআলা : কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করলে মূল্য সদকা করে দেওয়ার নিয়্যাতে বিক্রি করবে। সদকার নিয়্যাত না করে নিজের খরচের নিয়্যাত করা গোনাহ। নিয়্যাত যা-ই হোক বিক্রীত অর্থ পুরোটাই যাকাতের উপযুক্ত কাউকে সদকা করে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/৩০১, কাযীখান ৩/৩৫৪)

মাসআলা : কোরবানীর চামড়ার বিক্রীত মূল্য যাকাতের উপযুক্ত খাতে সদকা করা জরুরি, তা মাদরাসা-মসজিদ ইত্যাদির নির্মাণে খরচ করা সহীহ হবে না। (রদ্দুল মুহতার ২/৩৪৪)

কোরবানীর পশুতে ভিন্ন ইবাদতের নিয়্যাতে শরীক হওয়া :

মাসআলা : এক কোরবানীর পশুতে আকীকা, হজের কোরবানী ও অন্যান্য ইবাদতের নিয়্যাত করা যাবে। এতে প্রত্যেকের নিয়্যাতকৃত ইবাদত আদায় হয়ে যাবে। (মাবসূতে সারাখসী ৪/১৪৪, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬)

মাসআলা : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কোরবানীর গরু, মহিষ ও উটে আকীকার নিয়্যাতে শরীক হতে পারবে। এতে কোরবানী ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬)

মাসআলা : যার আকীকা সে নিজে এবং তার মা-বাবাসহ সকলেই আকীকার গোশত খেতে পারবে। (ইলাউস সুনান ১৭/১২৬)

ঈদের দিন কোরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা :

মাসআলা : ঈদুল আযহার দিন সর্বপ্রথম নিজ কোরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কোরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নাত। এই সুন্নাত শুধু ১০ যিলহজের জন্য। (জামে তিরমিযী, হা. ৫৪২, আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৬)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

গোনাহগার ব্যক্তিকে হেয় করার উপায় নেই :

যার যার ইবাদতের ওপর আত্মতুষ্টিই বা কিভাবে করা যাবে। বরং কৃত ইবাদতের ওপর ভয় থাকা জরুরি। তা কবুল হলো কি না, এর হক আদায় হলো কি না। গোনাহ ও পাপকাজকে হেয় করতে হবে। কিন্তু গোনাহগার বান্দাকে নয়। যেমন কোনো আলেম, মুত্তাকী পরহেজগার ব্যক্তির ওপর বাচ্চা প্রস্রাব করে দিল। যার কারণে তাঁর কাপড়চোপড় সব নাপাক হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তাকে মুসল্লায় যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু এর কারণে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হবে না। বরং তার সাথে পূর্বের মতোই সর্বপ্রকার সম্পর্ক বজায় থাকবে। বরং এর কারণে তাকে এবং কাপড়চোপড় পাক-পবিত্র করার ব্যবস্থা করা হবে। আরেকটি বিষয় হলো, যে ব্যক্তি গোনাহে লিপ্ত, হতে পারে তার তাওবার তাওফীক হয়ে যাবে।

দুই ভাই ছিল। তাদের একজন খুবই নেককার ও দ্বীনদার ছিল। দ্বিতীয়জন গোনাহে লিপ্ত ছিল। উভয়ই এক ঘরে থাকত। যে ভাই দ্বীনদার সে থাকত ওপরে। অন্যজন থাকত নিচে। সে একদিন চিন্তা করল, যাক তাওবা করে উন্নত জীবনে ফিরে যাই। এই ইচ্ছায় ওপরে যাওয়ার জন্য চলল। যে ওপরে থাকত সে চিন্তা করল, কিছুদিন বিনোদন করি। কামনা-বাসনা পূরণ করি। পরে তাওবা করে নেব। সে এই ইচ্ছায় নিচের দিকে চলতে লাগল। হঠাৎ তার পা পিছলে গেল। উভয়ের মধ্যে ধাক্কা লাগল। ঘটনাস্থলেই উভয়ই মৃত্যুবরণ করল। এখন দেখুন, তাদের পরিণাম কী হলো। স্বভাবতই সব কিছু নির্ভর করে নিয়্যাতের ওপর। ওপরে থাকা ব্যক্তি নিচে কোন ইচ্ছা নিয়ে আসছিল? যে নিচে থাকত সে ওপরে কী জন্য যাচ্ছিল? উভয়ের জীবন কিভাবে পরিচালিত ছিল; কিন্তু পরিশেষ কী দাঁড়াল? তাই কারো পক্ষে উত্তম কাজ করার তাওফীক হচ্ছে, নেক কাজ করছে–এর জন্য আত্মতুষ্ট না হওয়া। কারণ শেষটা কী হবে তা কারো জানা নেই। সেই কারণে সব সময়ই ভয় থাকতে হবে। শেষ পরিণাম ভালো হওয়ার এবং উত্তম আমলের তাওফীক হওয়ার জন্য দু'আ করতে হবে।

যেমন সম্পর্ক তেমন ফয়জ :

হযরত (রহ.) একদা মজলিশে তাশরীফ আনার পর বললেন, পাখাটা ছেড়ে দাও। ছেড়ে দেওয়া হলো। তখন তিনি বললেন, পাখার রেগুলেটারে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো, তার মধ্যে পাঁচটি স্তর থাকে। একের মধ্যে রাখা হলে পাখাটি হালকা গতিতে চলে, দুইয়ের মধ্যে একটু জোরে, তিনের মধ্যে আরো জোরে, চার-পাঁচে খুব জোরে ঘুরতে থাকে। এই পার্থক্য কেন? কারণ হলো প্রত্যেক নম্বরে পাখার সংযোগ বিদ্যুতের সাথে সেই স্তরেই হয়ে থাকে। এক নম্বরের সংযোগ কম থাকে। তাই কম ঘোরে। বিদ্যুতের সাথে পাখার সংযোগ যে স্তরের হয়ে থাকে তার চলার মধ্যে সেরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নিজের শায়খ ও উস্তাদ হলো কেন্দ্রবিন্দু। তার সাথে সম্পর্ক যে স্তরের হবে, সেই স্তরে উপকৃত হওয়া যাবে। যদি সম্পর্ক দুর্বল হয় উপকারও কম হবে। সম্পর্ক শক্তিশালী হলে উপকার বেশি হবে। এই আলোচনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয় কোনো কোনো ব্যক্তি শায়খের সাথে সম্পর্ক রাখে- কিন্তু তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। তাতে বোঝা গেল, তার সম্পর্ক দুর্বল। বুঝতে হবে যেমন সম্পর্ক, প্রভাবও তেমন হবে।

স্বার্থপরতা মুমিনের শান নয় :

বর্তমান যুগে অলসতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা একটি ব্যাপক রোগে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিকতার নিমিত্ত কাজ করে থাকে। কাজটা কোনোভাবে বুঝ দিতে পারলেই হলো। অন্যের শান্তি কাম্য হওয়াই মুমিনের শান। নিজেকে অন্যের জন্য বিসর্জন দেওয়া। পরের তরে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। এসব শূন্যের কোঠায় নেমে আসছে। পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদের যে ধারা তা এই কারণেই হয়ে থাকে। বিশেষ করে হজের মধ্যে কয়েকজনের জন্য একটি রুম হয়ে থাকে। এতে পাখা থাকে একটি। তখন প্রত্যেকেই চায় পাখার নিচে শুতে। তা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তাতেও তো একটি নিয়ম করা যায়। যেমন–একেকজন একেক সময় ওই জায়গায় থাকবে। প্রত্যেকেই যেন উপকৃত হতে পারে। অথবা প্রত্যেকে উত্তর-দক্ষিণ হয়ে শুয়ে পড়া, যাতে সকলের মাথা এক জায়গায় হয়ে যায়। তখন প্রত্যেকে একই সাথে উপকৃত হতে পারে। যা-ই হোক, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতারও সংশোধন হওয়া আবশ্যক।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

☆ হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলেন, বাংলাদেশের সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা আছে। এ দেশের লোকদের অভ্যাস ও স্বভাবে افـــــراط تـفـريط অর্থাৎ বেশিকরণ ও কমকরণের প্রবণতা আছে। কেউ ইবাদত-বন্দেগীতে সদা সর্বদা নিয়োজিত আর কেউ ইবাদতের ধারেকাছেও যায় না।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) এক বুজুর্গের আগমনের কথা শুনে তাঁর সাথে সাক্ষাতে গেলেন। যাওয়ার পর দেখেন বুজুর্গ সাহেব জরুরতে গেছেন। আর তিনি যেখানে নামায আদায় করেছেন তা বালুময় হওয়ায় দেখা গেল সিজদার স্থানে হাতের যে ছাপ পড়েছে তাতে আঙুল ফাঁকা। এই অবস্থা দেখে হাসান বসরী (রহ.) ওই বুজুর্গের সাথে সাক্ষাৎ না করেই ফিরে আসতে লাগলেন। তাঁর সাথী ও মুরিদগণ আরজ করলেন, হুজুর! অনেক কষ্ট করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন আর এখন সাক্ষাৎ না করেই চলে যাচ্ছেন কেন? হযরত হাসান বসরী (রহ.) বললেন, তাঁর সিজদায় হাতের আঙুল ফাঁকা, যা সুন্নাত পরিপন্থী। সুন্নাতের খেলাফ করে কেউ বুজুর্গ হতে পারে না। তাই চলে যাচ্ছি।

☆ হযরতওয়ালা বলেন, রমজান মাসের রহমতের দিনসমূহে আমাদের তিলাওয়াত, যিকির-আযকার, দরূদ শরীফ ও ইস্তেগফারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের ওপর রহমত নাজিল হচ্ছে।

☆ হযরত বলেন, প্রত্যেক ভালো কাজ ও ভালো স্থানে ডানকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নিম্নমানের কাজ ও নিম্নস্থানে বামকে প্রাধান্য দেওয়া সুন্নাত। তাই খাওয়ার জন্যও ডান হাত ব্যবহার হবে। চামচও ডান হাতে ধরা হবে। কারো কারো মেজাজে এক ধরনের পোকা থাকে। ডান হাতের আঙুলের সাথে খানার যে অংশ লেগে থাকে তারা সেগুলো সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। এটা সুন্নাতবিদ্বেষী হওয়ার পরিচয় বহন করে।

☆ হযরত বলেন, আমাদের যত আকাবীরকে খানা খেতে দেখেছি সবাইকে খানা খাওয়ার সময় চামচ ডান হাতে নিতে দেখেছি। আর তাঁরা কাউকে বাম হাতে চামচ ধরতে দেখলে কঠিন রাগান্বিত হতেন। হযরত ফকীহুল উম্মত মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.)-এর শাগরিদ সাহারানপুরের অধিবাসী এক মাওলানা সাহেব বর্ণনা করেন, মাজাহেরে উলূমে শিক্ষকতাকালীন আমি হযরতের সাথে খানায় শরীক ছিলাম। খাওয়ার মাঝখানে আমি বাম হাতে পানি পান করি। হযরত (রহ.) নম্রতার সাথে বুঝিয়ে বললেন, বাম হাতে পানি পান করতে নেই, পানি ডান হাতে পান করবে। এরপর আরেকবার হযরতের সাথে এ রকম ঘটনা হয়। সেবারও হযরত (রহ.) নম্রতার সাথে বুঝিয়ে দিলেন। তৃতীয়বার যখন এ রকম ঘটনা ঘটল তখন হযরত (রহ.) জোরে একটি থাপ্পড় লাগিয়ে দিলেন। এর বরকতে পরবর্তীতে আমি কখনো খানা খাওয়ার সময় বাম হাতে পান করিনি। কখনো ভুলে বাম হাতে গ্লাস নিয়ে নিলে তৎক্ষণাৎ হযরত (রহ.)-এর থাপ্পড়ের কথা মনে পড়ে যেত। ফলে মুখের কাছে যাওয়ার পূর্বেই গ্লাস ডান হাতে এসে যেত।

☆ সুন্নাতের নিয়্যাতে ডান পাশ দিয়ে হাঁটলেও সওয়াব পাওয়া যাবে। মুসাফাহা ডান দিক থেকে করা উচিত। معاشرت আচার-ব্যবহারে শরীয়তের খেয়াল রাখা চাই। হযরত থানভী (রহ.)-এর অধিকাংশ কঠোরতা ও রাগ প্রদর্শন আচার-ব্যবহারের ব্যতিক্রমের কারণে হতো।

☆ এ কথার ওপর সবাই একমত যে শান্তি কোথাও নেই। কিছু সুখ ও শান্তি থাকলে তা মসজিদ-মাদরাসায় আছে। কিছু কিছু আলেম (অনভিজ্ঞতার কারণে) কোনো অসুবিধায় পড়লে বিদেশ চলে যেতে চায়। অথচ যেখানে اصلاح তথা সংশোধনের সুযোগ ও পরিবেশ আছে, সেখানেই সে সুখ-শান্তি পায় না। আর যেখানে এসলাহের সুযোগ নেই, সেখানে সুখ-শান্তি কিভাবে পাবে? হযরতওয়ালা বলেন, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মসজিদ-মাদরাসার পরিবেশ ছাড়া কোথাও শান্তি নেই।

☆ মৃত্যুর ব্যাপারে কারো হাত নেই। তাই মৃত্যু চাওয়া নিষেধ। তবে হায়াত বৃদ্ধি, হায়াতে বরকত ইত্যাদি চাওয়া যায়।

☆ আপনি একজন আলেম হয়ে মসজিদ-মাদরাসার খেদমত ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা, বিদেশ গমন ইত্যাদির দিকে যেতে চাচ্ছেন, আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন ওই সব কাজে কল্যাণ ও উন্নতি হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই বরং ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। মাদরাসা-মসজিদে কিছু অসুবিধা আছে তাই বলে মসজিদ-মাদরাসা বাদ দিয়ে আরো বেশি অসুবিধা ও ক্ষতির দিকে

যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

☆ হযরত বলেন, মাদরাসার সব আসাতিযায়ে কেরাম যদি সুন্নাত যিন্দা করার মেহনত করে তখন মাদরাসায় কোনো অসুবিধা ও ফেতনা-ফ্যাসাদ থাকবে না।

☆ হযরতওয়ালা বলেন, মাদরাসায় যেকোনো কাজ করার সময় হেকমত তথা পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। শিক্ষাবিষয়ক কাজেও হেকমতের খেয়াল করা চাই। তরবিয়তমূলক কাজে তো হেকমতের প্রতি নজর দেওয়া আরো বেশি প্রয়োজন।

☆ কাজের দ্বারা অন্যের ওপর প্রভাব পড়ে। কথার দ্বারা নয়। হ্যাঁ, কথার দ্বারা প্রভাবের মধ্যে শক্তি তৈরি হয়। মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরার আদর্শ ও নিয়মনীতি অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা না করে শুধু বসুন্ধরার কথা বলার দ্বারা প্রভাব সৃষ্টি হবে না। সুলূক ও তরীকতের পথিক যদি প্রথমেই মুখ চালু করে ফেলে তখন তার দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হবে না। কথা তো বাতাসে উড়ে যাবে। হযরত থানভী (রহ.)-এর আখলাকে প্রভাবিত হয়ে খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.) জিজ্ঞেস করেছিলেন–

تو مجمل از جمال کیستی
تو مکمل از کمال کیستی

কার সৌন্দর্য আহরণ করে আপনি সুন্দর হলেন, কার গুণে আপনি গুণান্বিত হলেন। সাথে সাথেই হযরত থানভী (রহ.) এর জবাব–

من مجمل از جمال حاجیم
من مکمل از کمال حاجیم

আমি আমার শায়খ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.)-এর কাছ থেকে সৌন্দর্য আহরণ করেছি। আমি হাজী সাহেব (রহ.)-এর গুণে গুণান্বিত হয়েছি।

☆ হযরত বলেন, বড়ই আশ্চর্যের কথা, মাদরাসার মুহতামিম সাহেব ও অন্যান্য আসাতিযায়ে কেরাম সর্বদা তালেবে ইলমের সংশোধনের চিন্তায় চিন্তিত থাকেন। অথচ নিজের ইসলাহের কোনো ফিকির রাখেন না।

☆ হযরতওয়ালা বলেন, খাজা সাহেব (রহ.)-এর দ্বীনি পরিচিতি দেখে তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের জাতীয় কবি জিগর মুরাদাবাদী প্রভাবিত হলেন। তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তন হয়ে গেল। জিগর মুরাদাবাদীর পরিবর্তনের পেছনে তাঁর হিম্মত ও দৃঢ় ইচ্ছার বড় ভূমিকা ছিল।

☆ হযরত বলেন, মানুষকে যেহেতু দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই মানুষের সব কাজের মধ্যে দুর্বলতার একটা ছাপ থাকে। হিম্মত ও ইচ্ছার মধ্যেও দুর্বলতা থাকে। তাওবাও দুর্বল হয়। তাওবা করার পর আবার গোনাহ করে বসে। এই দুর্বলদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রহমাতুল লিল আলামীন বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। রহমতের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

ما أصر من استغفر و ان عاد فی الیوم سبعین مرة (رواه الامام ابوداود فی السنن ، کتاب الصلاة ، باب فی الاستغفار (١٥١٤) والامام الترمذی فی السنن ، کتاب الدعوات ، باب دعاء النبی ﷺ ١٠٧ (٣٥٥٩) بلفظ "ولو فعله فی الیوم ---"

"যদি কোনো ব্যক্তি গোনাহ হয়ে যাওয়ার পর এস্তেগফার করে, আল্লাহ তা'আলার কাছে গোনাহ মাফ চায় তাকে গোনাহগার হিসেবে গণ্য করা হবে না। যদিও সে দিনে সত্তরবার ওই গোনাহ করে বসে।

☆ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) মক্কা শরীফ থেকে হযরত থানভী (রহ.)-এর কাছে চিঠি লিখলেন, বললেন, যদি কখনো কানপুর মাদরাসা থেকে তোমার দিল উঠে যায় তখন আমাদের খানকাহে বসে যাবে।

☆ হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-এর থানা ভবনের খানকাহ ১২৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৭ ঈসায়ী সনে বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৫ হিজরী সনে হযরত থানভী (রহ.) এসে আবাদ করেন। অথচ তখন হযরতের না কোনো জমিজমা ছিল, না অন্য কোনো আসবাব ছিল। কিন্তু হযরতের এখলাসওয়ালা হিম্মতের বরকতে খানকাহ আবাদ হয়। এই খানকাহের বদৌলতে হযরত থানভী (রহ.) হাকীমুল উম্মত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ থানা ভবনের নাম বাকি থাকবে।

☆ হযরত বলেন, تردد তথা সংশয়ের অবস্থায় বরকত আসে না। ইয়াকীনওয়ালা হিম্মত থাকলে বরকত পাওয়া যায়। একদা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) আপন শায়খ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.)-এর কাছে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। জবাবে হাজী সাহেব (রহ.) বললেন, এখন চাকরি ছাড়বেন না। কারণ পরামর্শ চাওয়ার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে আপনার অন্তরে تردد তথা সংশয় আছে। এমতাবস্থায় আপনি চাকরি ছেড়ে দিলে বিকল্প যদি কোনো ব্যবস্থা না হয় তখন আপনি কঠিন পেরেশানিতে পড়বেন। আর যখন সময় হবে তখন পরামর্শ চাওয়া ছাড়াই এমনিতেই চাকরি ছেড়ে দেবেন।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী নূর মুহাম্মদ

'সিরাতে মুস্তাকীম' বা সরল পথ

খ্রিস্টধর্ম : কিছু জিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা-২

শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক্ব

'বাইবেল' আল্লাহর নাজিলকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল নাকি সেন্ট পলের ধর্মগ্রন্থ?

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সঠিক পথের দিশা দান করার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের প্রতি বহু আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যেমন–আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ.

"আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি কিতাব (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন সত্যতার সাথে, যা সত্যয়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের এবং তিনি নাজিল করেছেন এর পূর্বে (মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি) তাওরাত ও (ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি) ইঞ্জিল মানুষের হেদায়াতের জন্য...।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৩)

মহান আল্লাহই এ আসমানী গ্রন্থসমূহ নাজিল করেছেন। এগুলো কোনো মানুষের রচনা ছিল না। আসমানী সকল কিতাবের প্রতি ঈমান রাখা সকল ঈমানদারের কর্তব্য। তাই মুসলমানগণ যেমনিভাবে আখেরী নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর নাজিলকৃত পবিত্র কোরআনকে মহান আল্লাহর কালাম মর্মে তাঁর প্রতি ঈমান রাখেন, তেমনি পূর্বে নাজিলকৃত সকল আসমানী কিতাবের প্রতিও তাঁরা এ মর্মে ঈমান রাখেন যে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত, দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ যবুর এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল শরীফ মহান আল্লাহর কালাম, যা তিনি তাঁর প্রিয় নবী-রাসূলগণের প্রতি আসমান হতে অবতীর্ণ করেছেন।

আখেরী নবীর আনীত দ্বীন ও শরীয়ত যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সর্বজনীনতার গুণে গুণান্বিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ উম্মতের জন্য একমাত্র পবিত্র কোরআনই পালনীয় আসমানী কিতাব, কাজেই তার আগমনের পর অন্যান্য আম্বিয়া আলাইহিস সালাম যেমন–হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আনীত শরীয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে এবং সংগত কারণেই প্রকৃত মূল ধর্মীয় গ্রন্থরূপে কেবল পবিত্র কোরআনই অবিকৃতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এর বিপরীতে অন্য কোনো আসমানী কিতাবের মূল কপি পৃথিবীর কোথাও বিদ্যমান নেই।

ইহুদি ও খ্রিস্টান বন্ধুরা 'বাইবেল' নামক গ্রন্থকে "হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত, দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ যবুর এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল বলে প্রচার করে। কিন্তু বাস্তবতা, তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তি-বিবেচনার আলোকে বাইবেলকে কখনোই আল্লাহর নাজিলকৃত মূল তাওরাত, মূল যবুর ও মূল ইঞ্জিল বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল যে ভাষায় নাজিল হয়েছে, সে ভাষায় প্রচলিত বাইবেলের সংস্করণ কপি থাকলেও 'মূল' হিসেবে স্বীকৃত কোনো উৎস তাতে নেই! বরং বাইবেলের উৎসমূল হিসেবে খ্রিস্টসমাজে স্বীকৃত হলো 'গ্রিক' ভাষায় রচিত বাইবেল!

কাজেই প্রচলিত এ বাইবেলের প্রতি ঈমান আনা তথা এগুলোকে প্রকৃত আসমানী গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করা এবং তা মান্য করা জরুরি নয়। এ পুস্তকগুলোর ব্যাপারে আমাদের করণীয় হলো–

১. ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো ধরনের অনুসরণ না করা; বরং কোরআন-সুন্নাহ মতে আমল করা।

২. বিশ্বাস রাখার ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস রাখা যে 'এ সকল গ্রন্থের যে সকল কথা ও কাহিনী কোরআন-হাদীস সত্য বলেছে সেগুলো সন্দেহাতীতভাবে সত্য ও গ্রহণযোগ্য। আর যেগুলোকে কোরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে সেগুলো নিঃসন্দেহে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত। আর যেগুলোর ব্যাপারে কোরআন-হাদীস নীরব; সত্য বা মিথ্যা কোনো মন্তব্য করেনি, সেগুলোর ব্যাপারে আমারও মন্তব্য করব না, নীরব থাকব। অর্থাৎ আমরা সেগুলোকে সত্য বলেও গ্রহণ করব না, আবার সরাসরি মিথ্যাও বলব না। সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ

করেন,

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم

"তোমরা আহলে কিতাব [ইহুদি-খ্রিস্টান]-কে [তাদের কিতাবের ব্যাপারে] সত্যয়নও করো না, আবার মিথ্যা প্রতিপন্নও করো না।" [সহীহ বোখারী; باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها)

বাইবেল পরিচিতি

গ্রিক biblion ল্যাটিন biblia ও ইংরেজি bible শব্দটির অর্থ 'গ্রন্থমালা'। খ্রিস্টানরা যে গ্রন্থকে বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দাস নামে অভিহিত করে তার দুটি অংশ রয়েছে–

১. Old Testament (পুরনো নিয়ম)। এ অংশে মোট ৩৯টি পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে আদি পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ, রাজাবলী, গীতসংহিতা, হিজকিল নামক পুস্তক উল্লেখযোগ্য। পুরনো নিয়মের ৩৯টি পুস্তকের প্রথম পাঁচটি পুস্তককে তারা "তাওরাত" এবং "গীত সংহিতা" পুস্তককে "যবুর" বলে।

২. New Testament (নতুন নিয়ম)। এ অংশে মোট ২৭টি পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে মথি, মার্ক, লূক, যোহন, প্রেরিত, রোমীয়, করিন্থীয়, গালাতীয়, পিতর নামক পুস্তক অন্যতম। নতুন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তককে তারা ইঞ্জিল বলে। এই মোট ৬৬টি গ্রন্থের সমষ্টিকে খ্রিস্টানরা "বাইবেল" বলে থাকে।

উল্লেখ্য, বাইবেলের পুস্তকের উল্লিখিত সংখ্যাটি প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের বাইবেল অনুসারে। মূল গ্রিক বাইবেল বা ক্যাথলিক বাইবেলের পুস্তকের সংখ্যা ৭৩টি। প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথার [১৫২৯খ্রি.] ৭টি পূর্ণ পুস্তককে জাল বলে বাতিল করেন। বাকি পুস্তকগুলো থেকেও অনেক অধ্যায় ও আয়াত বাতিল করেন। এ জন্য প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে বইয়ের সংখ্যা ৬৬টি।

ক্যাথলিক বাইবেল বাংলায় 'পবিত্র বাইবেল', 'জুবিলী বাইবেল' নামে পরিচিত। প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলটি 'পবিত্র বাইবেল' নামে প্রথম উইলিয়াম কেরি কর্তৃক অনূদিত ও বিভিন্ন সময়ে পরিমার্জিত হয়ে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক 'কিতাবুল মোকাদ্দাস' নামে প্রকাশিত।

ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণের আলোকে এ বিষয়টি প্রমাণিত যে খ্রিস্টানরা যে গ্রন্থগুলোকে তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল নাম দিয়ে থাকে, এ তিনটি কিতাবের কোনোটিই আল্লাহর অবতীর্ণ প্রকৃত তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল নয়।

তাওরাত নাজিল হয়েছিল হিব্রু ভাষায়, যবুর গ্রিক ভাষায় আর ইঞ্জিল সুরয়ানি বা সেমিটিক ভাষায়। এ কিতাবগুলোর মূল বা অনুবাদ কিছুই আর এখন বর্তমান নেই। বাইবেল বলে যা প্রচলিত রয়েছে, তা মূলত বেনামি লেখক কর্তৃক ভিন্নভাবে সংকলিত পুস্তক, যার ওপর দিয়ে যুগ পরম্পরায় সম্পাদনার 'ঝড়' বয়ে গেছে! যদ্দরুন বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলগুলোর সংস্করণগুলোর মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক বৈপরীত্য। তবে এ কথা সত্য যে এ গ্রন্থগুলোতে আল্লাহ তা'আলা এবং নবীগণের কিছু কিছু বাণী উদ্ধৃত হয়েছে মাত্র, কিন্তু দানা আর ভুসি মিলে গেলে যেভাবে দানাকে পৃথক করা সম্ভব হয় না, তেমনি এগুলো বিকৃতির এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, তার সত্যতা কোরআনের সহায়তা ছাড়া নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সর্বোপরি কোনো বইয়ে আল্লাহর বাণী উদ্ধৃত হলেই কি সেটা আসমানী গ্রন্থ হয়ে যাবে? তাহলে তো মুসলিম মনীষীদের লেখা কোরআনের উদ্ধৃতিসংবলিত সকল গ্রন্থকেই কোরআন বলতে হবে...!! মোটকথা, কোনো গ্রন্থে কারো বাণী উদ্ধৃত হওয়া আর সে গ্রন্থটি তার লিখিত হওয়া সম্পূর্ণই ভিন্ন বিষয়।

কোরআনের আলোকে বাইবেল পর্যালোচনা

কোনো গ্রন্থকে আসমানী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করার পূর্বশর্ত হলো–

১. সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে গ্রন্থটি কোনো নবীর উপর নাযিল হয়েছে নবীর মাধ্যমে লিখিত হয়েছে।

২. সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে উক্ত নবী গ্রন্থটিকে যেভাবে রেখে গেছেন, হুবহু কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ছাড়া গ্রন্থটি 'অবিচ্ছিন্ন সূত্রে'[১] আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

'ঐশী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যক এ শর্ত দুটি মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। আমাদের খ্রিস্টান বন্ধুরাও তা ভালো করে জানেন। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবেতাবেঈগণের ধারাবাহিকতায় আজ ১৪০০ বছর পর পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে লক্ষ-কোটি 'হাফেজে কোরআন'-এর হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামকে সংরক্ষণ করেছেন। এই ১৪০০ বছরের মধ্যে যদি কোনো যুগে বিদ্যমান কোরআনের সকল কপিও বিলুপ্ত করে দেওয়া হতো, কিংবা বর্তমানেও যদি এমনটি করা হয়, তবে লক্ষ-কোটি হাফেজে কোরআনের হৃদয় থেকে তা পুনরায় সম্পূর্ণ অবিকৃতরূপে এমনকি স্বরচিহ্নসহ লিখে ফেলা সে যুগেও যেমন সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ছিল না, বর্তমানেও সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য নয়!

দ্বিতীয়ত, নবীজির হাদীস হিসেবে স্বীকৃত বাণীগুলো মহান আল্লাহ এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে প্রত্যেকটি হাদীসের বর্ণনাকারী থেকে নিয়ে নবীজি পর্যন্ত 'অবিচ্ছিন্ন সূত্র' পরম্পরা রয়েছে। আজ ১৪০০ বছর পরও যখন কোনো নবীর ওয়ারিস আলেমে দ্বীন কোনো হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি নবীজি থেকে নিজ পর্যন্ত সে হাদীস বর্ণনাকারীদের অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সহজেই বলে দিতে পারবেন। এমনকি বর্ণনাকারীদের যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, সততা ও ধার্মিকতার বিষয়েও সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তিনি উল্লেখ করতে পারবেন!

আল্লাহ তা'আলা অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরার নেয়ামত ও ঐশ্বর্য কেবল উম্মতে মুহাম্মদীকে দিয়েছেন। আর তা এ কারণে যে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনীত শরীয়ত, অর্থাৎ কোরআন ও হাদীস কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পালনীয় একমাত্র ঐশী গ্রন্থ!

বর্তমানে প্রচলিত তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল বলে খ্যাত বাইবেলের পুরনো ও নতুন নিয়মের মধ্যে 'ঐশী গ্রন্থের' এ শর্ত দুটি কোনোভাবেই পাওয়া যায় না। কোরআন-হাদীস এবং বাইবেলের উদ্ধৃতি থেকে আমরা বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করছি–

আহলে কিতাব [ইহুদি-খ্রিস্টানরা] যে তাদের আসমানী কিতাব বিকৃত করে ফেলেছে, এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "সুতরাং ধ্বংস সে সকল লোকের জন্য, যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে অতঃপর (মানুষকে) বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ হতে' যাতে তার মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা রচনা করেছে, সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে, সে কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।" (সূরা বাকারা : আয়াত নং-৭৯)

হাদীসের আলোকে বাইবেল পর্যালোচনা :

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা 'আহলে কিতাব' (ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়)-এর কাছে ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে কেন জিজ্ঞেস করো? অথচ তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তা আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ এবং তাজা সংবাদ। তোমরা তা পাঠ করে থাকো, তাতে ভুলের কোনো আশঙ্কা নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (কোরআনে) বলে দিয়েছেন যে তারা তাদের কিতাব তথা তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিকৃতি সাধন করেছে এবং নিজেদের হাতে সেগুলোতে পরিবর্তন করেছে। অতঃপর (তারা লোকদেরকে) বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ হতে' যাতে তার মাধ্যমে সামান্য কিছু আয়-রোজগার করতে পারে। আল্লাহর কসম! আহলে কিতাবদের কেউই তো তোমাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব কোরআন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে না! (তাহলে তোমরা কেন জিজ্ঞেস করো?)–সহীহ বোখারী; হাদীস নং ২৬৮৫

বাইবেলের আলোকে 'পুরনো নিয়ম' পর্যালোচনা

খ্রিস্টধর্মে প্রচলিত বাইবেলের পুরনো নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তককে তাওরাত নাম বলে নামকরণ করা হয়। অথচ যদি বাইবেল গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয় তাহলে মতভিন্নতার সুযোগ তৈরি হয়ে যায়। পাঠক লক্ষ করুন–

১. পুরনো নিয়মের ৩৯টি পুস্তকের প্রথম যে পাঁচটি পুস্তককে "তাওরাত" বলা হচ্ছে, তার লেখক প্রসঙ্গে কিতাবুল মোকাদ্দাসে বলা হয়েছে যে, এর লেখক হলো হযরত মুসা আলাইহিস সালাম! কিতাবুল মোকাদ্দাসের এ বক্তব্যই প্রমাণ করে যে খ্রিস্টানদের প্রচলিত তাওরাত আল্লাহর অবতীর্ণ তাওরাত নয়। কেননা কোরআনে (সূরা আরাফ : আয়াত নং ১৪৫) বলা হয়েছে, তাওরাত মুসা আলাইহিস সালাম নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কাষ্ঠফলকে লিখে মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

২. "তাওরাতের লেখক হযরত মুসা আলাইহিস সালাম" খ্রিস্টান বন্ধুদের এ দাবিও সঠিক নয়। কেননা তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণ (৩৪:৫-৮)-এ মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে–

"তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে গমন করিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎ-পিয়োরে সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাহাকে কবর দিলেন, কিন্তু তাহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশির বয়স এক শত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল। তাহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই ও তাহার তেজও হ্রাস হয় নাই। পরে ইস্রায়েল সন্তানগণ মোশির নিমিত্ত মোয়াবের তলভূমিতে ত্রিশ দিন রোদন করিল, এইরূপে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের দিন সম্পূর্ণ হইল।" (দ্বিতীয় বিবরণ : ৩৪:৫-৮) ২

এখন পাঠকই বিবেচনা করুন, লেখকের পক্ষে তার লিখিত বলে দাবি করা গ্রন্থে নিজের মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করা কিভাবে সম্ভব?

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, তাওরাতের লেখক যখন আল্লাহ তা'আলা নন এবং

নন মুসা আলাইহিস সালামও, তাহলে এর লেখক কে? এ প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো, তাওরাত নামে খ্যাত এ পুস্তক আসলে অজ্ঞাতনামা কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর, যিনি জনসমাজে প্রচলিত হযরত মুসা আলাইহিস সালামের বাণীসমূহকে পুঁজি করে নিজের মতো করে এটা লিখেছিলেন। আর এটাই কথিত তাওরাতের পঞ্চপুস্তকের মূল পাঠ। এ ব্যাপারে ইতিহাস থেকে কয়েকটি দলিল পেশ করছি–

১. বাইবেলের বর্ণনা মতে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তাওরাতের পাণ্ডুলিপিটি ইসরায়েল সন্তানগণের যাজক ও গোত্রপতিগণের নিকট সমর্পণ করে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁরা যেন সে পাণ্ডুলিপিটি সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষণকরত প্রতি সাত বছর পর পর সকল ইসরায়েলের সামনে তা পাঠ করেন।[৩] ইসরায়েল সন্তানগণের প্রথম প্রজন্ম মোশির (হযরত মুসার) এই নির্দেশ মেনে চলে। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম পাপাচারিতা ও ধর্মদ্রোহিতায় ডুবে যায়। শলোমনের (হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম) রাজত্বকালে যখন তিনি সিন্দুকটি খোলেন, তখন তাতে তাওরাতের কোনো অস্তিত্ব তিনি পাননি। সিন্দুকটির মধ্যে কেবল দুটি তাওরাতবহির্ভূত প্রাচীন প্রস্তরফলকই অবশিষ্ট ছিল। বাইবেলের প্রথম রাজাবলীর অষ্টম অধ্যায়ে নবম আয়াতে বলা হয়েছে, "সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না। কেবল সেই দুইখানা প্রস্তরফলক ছিল, যাহা মোশি হোরেবে তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন..."

২. খ্রিস্টপূর্ব ৯৭৫ অব্দে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র 'রাহবিআম' (Rehoboam) ইস্রায়েলিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ১০ জন পুত্রের বংশধরগণ তাঁর অপর দুই পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও বিনইয়ামীন-এর বংশধরগণ থেকে পৃথক হয়ে ফিলিস্তিনের উত্তর দিকে একটি ভিন্ন রাষ্ট্র কায়েম করে। ফলে বনী ইসরায়েল সম্প্রদায় দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়– (১) ফিলিস্তিনের দক্ষিণ ভূখণ্ডে 'যুডা' (Judah) রাষ্ট্র, যার রাজধানী ছিল জেরুজালেম (Jerusalem)এবং তার নেতৃত্ব ছিল 'রাহবিআম' (Rehoboam)-এর হাতে (২) বিদ্রোহী দশ গোত্রের সমন্বয়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তিনের উত্তর ভূখণ্ডে 'ইসরায়েল' (Israel), যার রাজধানী ছিল 'সামারিয়া' (Samaria)।

এ দুটি রাষ্ট্র গঠন করলেও ইহুদিরা এখানে তাদের ধর্মীয় স্বকীয়তা বেশি দিন বজায় রাখতে সক্ষম হননি। দুটি রাষ্ট্রই একসময় পৌত্তলিকতা আর মূর্তিপূজায় চরমভাবে জড়িয়ে পড়ে। কাজেই মূর্তিপূজক জাতির দ্বারা যে তাওরাতের সংরক্ষণ সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়।[৪]

৩. উপরন্তু ধর্মীয় এ অস্থিরতার মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা 'ইসরায়েল রাষ্ট্রের' ওপরে 'আশুরী' জাতিকে চাপিয়ে দেন। খ্রিস্টপূর্ব ৭৪০ অব্দে আশুরীয় (Assyrians) সম্রাট Tiglath-Pileser III (৭৪৫-৭২৭ ইঈ) (তৃতীয় তিগলাস পিলেসার) ইসরায়েল রাষ্ট্রের ওপর বিভীষিকাময় তাণ্ডব চালান। এ সময় ইহুদিদের একটি বড় অংশকে তিনি বর্তমান জর্দানের কোনো এক স্থানে বন্দি করে নিয়ে যান। এরপর খ্রিস্টপূর্ব ৭২১ অব্দে আশুরী সম্রাট Sargon II (৭২২-৭০৫ ইঈ) (দ্বিতীয় সারগন) বেঁচে যাওয়া ইসরায়েলিদের বন্দি করে ইরাকে নিয়ে যান। এভাবেই ইসরায়েল রাষ্ট্রের পতন ঘটে। ইসরায়েল রাষ্ট্রের পতন ঘটলেও দক্ষিণ ভূখণ্ডের 'জুডা' (Judah) রাষ্ট্রটি তখনও ছিল, যদিও কালক্রমে তা পরিণত হয়েছিল একটি মূর্তিপূজক রাষ্ট্রে। খ্রিস্টপূর্ব ৬১০ অব্দে মিসরীয়রা বেঁচে যাওয়া যুডা রাষ্ট্রের ইসরায়েলিদের ওপর হামলা চালায় এবং তাদেরকে গোলামির জীবনযাপনে বাধ্য করে।[৫] এই তাণ্ডব এবং পলায়নরত অবস্থায় ইসরায়েলিদের জন্য তাওরাত সংরক্ষণ করা কিভাবে সম্ভব ছিল?

৪. এর পরবর্তী সময়ে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম[৬]-এর বংশের শাসক Josiah, son of Amon (যোশিয়া বিন আমোন) খ্রিস্টপূর্ব ৬৪১ অব্দের কাছাকাছি সময়ে 'জুডা' (Judah) রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাওরাতের কোনো প্রসিদ্ধি বা প্রচলন পাওয়া যায় না। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের ১৮ বছর পরে হিল্কীয় মাহাযাজক (HilkiOah the high priest) 'সদাপ্রভুর গৃহে' অর্থাৎ জেরুজালেমের ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দিরের মধ্যে মুসা আলাইহিস সালামের তাওরাত পেয়েছেন বলে দাবি করেন।[৭]

আশ্চর্যের বিষয় হলো, হিল্কীয় মাহাযাজক কর্তৃক তাওরাত প্রাপ্তির আগে 'সদাপ্রভুর গৃহ' দুইবার [আশুরিয়ীন ও মিসরীয়দের দ্বারা] লুণ্ঠিত হয়ে তা প্রতিমাগৃহে পরিণত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সদাপ্রভুর গৃহের রক্ষক, প্রতিমাপূজারীগণ প্রতিনিয়তই এ ঘরে প্রবেশ করত, তা সত্ত্বেও তারা কেউ তাওরাতটি দেখতে পাবে না–এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কাজেই বাস্তবতা এটাই যে হিল্কীয় মাহাযাজক নিজে এ তাওরাত সংকলন করে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন! কাজেই তাওরাতের এ

কপিটি মোটেও নির্ভরযোগ্য ছিল না।

৫. এর কয়েক বছর পরে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে যখন ব্যাবিলন সম্রাট বুখতে নসর (Nebuchadnezzar II)[৮] জেরুজালেম নগরী ধ্বংস করে সকল ইহুদিকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান, তখন এই অনির্ভরযোগ্য ও সূত্রবিহীন কপিটির প্রায় পুরোটুকুই হারিয়ে যায় এবং তাওরাত বা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পূর্বেকার সকল গ্রন্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে একেবারেই বিলীন হয়ে যায়।

৬. ইহুদিরা দাবি করে, ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ইয্রা [হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম] তাওরাত পুনরায় সংকলন করেছিলেন। যদি তাদের এ বক্তব্য মেনেও নেওয়া হয়, তবু বলতে হয় যে খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সালে Antiochus (এন্টিওকাস)-এর হামলার পর সংকলিত এ পুস্তকগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়![৯]

ইহুদিদের ওপর আগ্রাসন এবং নিপীড়নের ব্যাপারে এন্টিওকাসের Antiochus আক্রমণ অন্যতম। সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত এন্টিওকাস ইহুদিদের ওপর গণহত্যা চালান। এটা এতটাই নির্মম ছিল যে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদিদের রক্তের বন্যা বয়ে যায়! এ হামলার সময় তাওরাতের সমস্ত পুস্তক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এন্টিওকাসের এ হামলার বিবরণ রয়েছে ১ Maccabees (১:৫৬-৫৭) গ্রন্থে

Any scrolls of law they found they tore up and burned. Whoever was found with a scroll of the covenant, and whoever observed the law, was condemned to death by royal decree.

'খোদায়ী আইন পুস্তকসমূহের এমন কোনো কপি ছিল না, যা ফেঁড়ে ফেলা বা ভস্মীভূত করা হয়নি। এমন কোনো লোক পাওয়া গেলে যার নিকট এর কোনো কপি সংরক্ষিত আছে বা সে খোদার বিধি-বিধানের অনুসরণ করে (অর্থাৎ ইহুদি), রাজার নির্দেশ অনুসারে তাকে হত্যা করা হতো..![১০]

বাইবেলের আলোকে 'নতুন নিয়ম' পর্যালোচনা :

নতুন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তক মথি, মার্ক, লূক, যোহন (যোহন) নামে প্রচারিত সুসমাচারগুলোকে তারা ইঞ্জিল বলে অভিহিত করে।

নতুন নিয়মের যে চারটিকে ইঞ্জিল বলা হচ্ছে, তা মূলত পৌলীয় ধর্মের প্রাধান্য লাভের পর তার অনুসারীদের দ্বারা গ্রিক ভাষায় সংকলিত বেনামি ইঞ্জিল। খ্রিস্টানরা নতুন নিয়মের ২৭টি পুস্তকের সমষ্টিকে বাইবেল বললেও খ্রিস্টানদের গির্জা কর্তৃক স্বীকৃত ইঞ্জিলের পুস্তক চারটি এবং অধিকাংশ খ্রিস্টান বন্ধু মনে করেন, (যেমনটি ইঞ্জিল শরীফের বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে) ইঞ্জিল শরীফ নামে খ্যাত এ চারটি পুস্তক রচনা করেছেন, ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনয়নকারী একান্ত অনুগত ১২ জন শিষ্যের অন্যতম চারজন শিষ্য। যথা : মথি, মার্ক, লূক ও যোহন ওরফে ইউহোন্না। এ ছাড়া বাকি ২৩টি পুস্তককে বিগত দুই হাজার বছরে কোনো একজন খ্রিস্টানও 'ইঞ্জিল' বলে দাবি করেননি। [যদিও বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ জেনেশুনে ২৭ গ্রন্থের এ পুস্তকের পুরোটাকেই "ইঞ্জিল শরীফ" নামে আখ্যায়িত করে সরলপ্রাণ মানুষদের ধোঁকা দিচ্ছে।] যে চারটি পুস্তককে খ্রিস্টান বন্ধুগণ ইঞ্জিল বলে প্রচার করছেন, সেগুলোও আল্লাহর নাজিলকৃত মূল ইঞ্জিল কখনোই নয়। এর কিছু তথ্য-প্রমাণ নিম্নরূপ–

১. বাইবেলের লেখক প্রসঙ্গ

খ্রিস্টধর্মে দাবি করা হয় যে, "কথিত ইঞ্জিলের চার পুস্তকের লেখক হলেন ঈসা আলাইহিস সালামের ১২ জন শিষ্যের অন্যতম চারজন।" কিন্তু এ দাবি সঠিক নয়, বরং অজ্ঞাতনামা কেউ তা লিখে উল্লিখিত চারজন শিষ্যের নামে চালিয়ে দিয়েছে। সত্যাশ্রয়ী অনেক খ্রিস্টান পণ্ডিতও তা স্বীকার করেছেন–

(ক) ইংল্যান্ডের চিচেস্টার (Chichester) ক্যাথিড্রালের পাদ্রি জে.বি. ফিলিপস 'মথিলিখিত ইঞ্জিলের ভূমিকায় লিখেছেন : Early tradition ascribed this Gospel to the apostle Matthew, but scholars nowadays almost all reject this view.

"প্রাচীন ঐতিহ্য প্রথম সুসমাচারের রচনাকার্যকে প্রেরিত মথির প্রতি আরোপ করেছিল, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের প্রায় সকলেই আজকাল এ মত পরিত্যাগ করেছেন।"

(খ) বাইবেলের ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশনের ভাষ্যকাররা বলেন :

The majority of critics do not accept the hypothesis that the Gospel was written by John, although this possibility cannot be entirely ruled out. Everything points however towards the fact that the text we know today had several authors.[১১]

'আজ যোহনের নামে যে সুসমাচারটি আমরা পাচ্ছি, তার লেখক ছিলেন একাধিক ব্যক্তি।

(গ) খ্রিস্টান পণ্ডিতদের লেখা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার Biblical Literature-এর বক্তব্য হলো–

Indeed, until c. AD 150, Christians could produce writings either anonymously or preudonymously - i.e., using the name of some acknowledged important biblical or apostolic figure. The practice was not believed to be either a trick or fraud.

১৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে যেকোনো খ্রিস্টান নাম প্রকাশ না করে, অথবা কোনো প্রসিদ্ধ বাইবেলীয় ব্যক্তিত্ব বা যিশুর শিষ্যদের নামে বই লিখতে পারত। এরূপ কর্মকে ছলচাতুরী বা প্রতারণা বলে গণ্য করা হতো না।

কাজেই সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে অজ্ঞাত কেউ মথি, মার্ক, লূক, যোহন নাম দিয়ে এগুলোকে তাদের লিখিত বাইবেল বলে প্রচার করেছে।

(ঘ) আর লূক তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মনোনীত ১২ জন শিষ্যের তালিকায় তার নাম নেই। উপরন্তু মথি এবং লূকের বর্ণনায় উল্লিখিত সে ১২ জন শিষ্যের নামের মধ্যেও রয়েছে মতবিরোধ। পাঠক লক্ষ করুন, সেই ১২ জন প্রেরিতের নাম এই এই–প্রথম, শিমোন, যাঁহাকে পিতর বলে এবং তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের পুত্র যাকোব এবং তাঁহার ভ্রাতা যোহন, ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও করগ্রাহী মথি, আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব ও থদ্দেয়, কানানী শিমোন এবং ঈষ্কারিয়োতীয় যিহূদা, যে তাঁহাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিল। (মথি ১০:২-৪)

আর লূকের বর্ণনায় রয়েছে, "পরে যখন দিবস হইল, তিনি আপন শিষ্যগণকে ডাকিলেন এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে ১২ জনকে মনোনীত করিলেন, আর তাঁহাদিগকে প্রেরিত নাম দিলেন– শিমোন, যাঁহাকে তিনি পিতর নামও দিলেন, ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয় এবং যাকোব ও যোহন এবং ফিলিপ এবং বর্থলময় এবং মথি ও থোমা এবং আল্‌ফেয়ের [পুত্র] যাকোব ও উদ্‌যোগী আখ্যাত শিমোন, যাকোবের [পুত্র] যিহূদা, এবং ঈষ্কারিয়োতীয় যিহূদা, যে তাঁহাকে [শত্রুহস্তে] সমর্পণ করে।" (লূক ৬:১৩-১৬)[১২]

পাঠক! উভয় বর্ণনাকে গভীরভাবে লক্ষ করুন। মথি এবং লূক–কারো বর্ণনাতেই 'লূক'-এর নাম নেই। দ্বিতীয়ত, মথির বর্ণনায় 'থদ্দেয়'-এর নাম রয়েছে, যা লূকের বর্ণনায় নেই। আর লূকের বর্ণনায় 'যাকোবের [পুত্র] যিহূদা'র নাম রয়েছে, যা মথির বর্ণনায় নেই...!!

(ঙ) যোহন লিখিত সুসমাচারে (২১:২৪-২৫) রয়েছে, সুসমাচারের লেখক লিখছেন "২৪ সেই শিষ্যই এ সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন এবং এই সকল লিখিয়াছেন; আর আমরা জানি, তাহার সাক্ষ্য সত্য। ২৫ যিশু আরো অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না।"[১৩]

এই আয়াত দুটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা হলে এবং "আমার" ও "আমরা"-এর সঙ্গে "সেই শিষ্য"... ও "তাহার"... তুলনা করা হলে, এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, "সেই শিষ্য" ও "তাহার" দ্বারা লেখক যোহনকে বুঝিয়েছেন এবং "আমার" ও "আমরা" দ্বারা নিজেকে/নিজেদেরকে বুঝিয়েছেন। এর স্পষ্ট অর্থ তো এটাই যে, যোহন এবং এ সুসমাচারের লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই ব্যক্তি! এই অজ্ঞাত লেখক যোহনের লিখিত কিছু পেয়েছিলেন, অতঃপর তিনি তা নিজের পছন্দমতো কমবেশি করে নিজের ভাষায় লিখেছেন!

সারকথা, খ্রিস্টানদের গির্জা কর্তৃক ইঞ্জিল হিসেবে স্বীকৃত চার পুস্তকের লেখকও অজ্ঞাতনামা। অবশিষ্ট ২৩টির ১৪টি যে পলের চিঠি তা তারাও মানে। অথচ সেন্ট পল নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার সব কথাই ঈশ্বরের আদেশে লেখা হয় নাই। (১ করিন্থীয় ৭:১২, ২৫)[১৪]

২. বাইবেলের ভাষা প্রসঙ্গ

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কথা বলতেন 'আরামাইক' ভাষায়, (আরবীতে 'আরামিয়া') যা মূলত 'হিব্রু' ভাষার একটি আঞ্চলিক রূপ। আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিল শরীফ এ ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে 'মূল' -এর খেতাব পাওয়া ইঞ্জিল হলো গ্রিক ভাষায় রচিত। হিব্রু ভাষায় সংকলিত বাইবেলের মূল ইঞ্জিল দুনিয়া থেকে অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি হিব্রু ভাষার কোনো বাইবেল সংস্করণ খ্রিস্টসমাজের কাছে 'মূল'-এর খেতাবও লাভ করেনি। কাজেই গ্রিক [কিংবা অন্য কোনো] ভাষায় সংকলিত ইঞ্জিল কিভাবে হিব্রু ভাষায় নাজিলকৃত মূল আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিল হতে পারে?

৩. স্ববিরোধী বক্তব্য প্রসঙ্গ

দ্বিতীয়ত, তাদের কথিত ইঞ্জিলে স্ববিরোধী বক্তব্য রয়েছে। এটা স্পষ্টতই এ কথা প্রমাণ করে যে, তাদের কথিত ইঞ্জিল প্রকৃত আসমানী গ্রন্থ নয়। একটি উদাহরণ লক্ষ করুন, মথি এবং লূক উভয়ে যিশুর বংশতালিকা প্রদান করেছেন, ১৫ কিন্তু উভয়ের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য স্ববিরোধিতা। পাঠক! লক্ষ করুন-

(ক) যিশুর দাদার নাম প্রসঙ্গ : মথি বলেন, 'যাকোব'। কিন্তু লূক বলেন,

'এলি'!

(খ) মথির বর্ণনা মতে, যিশু দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশধর। লূক থেকে জানা যায় যে, যিশু দায়ূদের পুত্র নাথন-এর বংশধর।

(গ) মথির ভাষ্য মতে, দায়ূদ থেকে ব্যাবিলনের নির্বাসন পর্যন্ত যিশুর পূর্বপুরুষগণ সকলেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। লূকের বর্ণনায় দায়ূদ ও নাথন বাদে যিশুর পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেউই রাজা বা কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না।

(ঘ) মথির বর্ণনা মতে, দায়ূদ থেকে যিশু পর্যন্ত উভয়ের মাঝে ২৬ প্রজন্ম। আর লূকের বর্ণনা মতে উভয়ের মাঝে ৪১ প্রজন্ম।

৪. অপবিত্র কথাবার্তা : আল্লাহ পাক প্রসঙ্গে

বাইবেল প্রকৃত আসমানী গ্রন্থ 'ইঞ্জিল' না হওয়ার একটি সুস্পষ্ট দলিল হলো, এতে মহান আল্লাহ পাক সম্পর্কে অপবিত্র কথাবার্তা রয়েছে–

(ক) যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭ ১৬-এর বর্ণনা মতে, স্রষ্টা অপরাধীর অপরাধের জন্য নিরপরাধকে শাস্তি দেন। পিতার অপরাধের কারণে ৪ পুরুষ পর্যন্ত বংশধরগণ শাস্তি পাবে বলে বিধান দিয়েছেন।

(খ) আদিপুস্তক ৩২:২৪-৩০ ১৭-এর বর্ণনা মতে, আল্লাহ সারা রাত ধরে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেন! শেষ রাতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাকে ছেড়ে দেন!! এ জন্য ইয়াকুবের নাম হলো "ইসরায়েল" অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে মল্লযুদ্ধকারী!!!

৫. অপবিত্র কথাবার্তা : আম্বিয়া আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে

আম্বিয়া আলাইহিস সালামের ব্যাপারে প্রচলিত বাইবেলে অনেক অশ্লীল কথাবার্তা রয়েছে, যা প্রমাণ করে, প্রচলিত বাইবেল কখনোই আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিল নয়।

(ক) বাইবেলের বর্ণনা মতে, আম্বিয়া আলাইহিস সালাম এবং তাদের সন্তানগণ ছিলেন ব্যাভিচারী ও ধর্ষক[১৮] এবং মদ্যপ।[১৯]

(খ) আদিপুস্তক ৯:২০-২৫[২০] রয়েছে যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম মদপান করে মাতাল হয়ে উলঙ্গ হন। তাঁর ছোট ছেলে হাম হঠাৎ পিতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে ফেলেন। মাতলামি কাটার পর বিষয়টি জেনে নূহ আলাইহিস সালাম ক্রুদ্ধ হয়ে হামের ছেলে কেনানকে অভিশাপ দেন!

(গ) হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাঁর এক প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন। এতে উক্ত মহিলা গর্ভবতী হয়ে পড়লে তিনি তাঁর স্বামীকে কৌশলে হত্যা করান এবং উক্ত মহিলাকে বিয়ে করেন। (২ শমূয়েল ১১:২-৫, ১৪-১৭)[২১]

বাইবেলের আলোকে 'গীতসংহিতা' পর্যালোচনা

১. খ্রিস্টানদের বাইবেলের শুরুতে বলা হয়েছে, গীতসংহিতা তথা যবুর লিখেছেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম। তবে তিনি পুরোটা লেখেননি। পক্ষান্তরে যবুর শরীফ বা গীতসংহিতা নামে যে গ্রন্থটি রয়েছে, তার শুরুতে কিতাবুল মোকাদ্দাসে বলা হয়েছে, লেখক হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম কমপক্ষে ৭৩টি কাওয়ালি লিখেছিলেন। আর যাঁদের নাম জানা যায় না, তাঁরা লিখেছিলেন ৪৯টি কাওয়ালি। এ ছাড়া হযরত আসাফ ১২টি, কারুনের ছেলেরা ১০টি, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ১টি, হযরত এথন ১টি, হযরত হেমল ১টি এবং হযরত উযায়ের একটি কাওয়ালি লিখেছেন। কিন্তু সর্বমোট ১৫০টি কাওয়ালির মধ্যে কোন্ কোন্টি দাউদ আলাইহিস সালামের আর কোন্ কোন্টি অন্যদের বা অজ্ঞাতনামা লেখকদের তা চিহ্নিত করা হয়নি।

তাদের এ কথা থেকেই প্রমাণ হয় যে, তাদের কথিত যবুর প্রকৃত আসমানী গ্রন্থ যবুর নয়। কেননা দাউদ আলাইহিস সালাম লিখেছেন বলে নির্ভরযোগ্য অবিচ্ছিন্ন কোনো সূত্র খ্রিস্টানদের কাছে নেই। আর তা ছাড়া অজ্ঞাতনামা লেখকদের লেখা গ্রন্থ কিভাবে আসমানী গ্রন্থ হতে পারে তা বোধ করি কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের বোধগম্য নয়।

২. অধিকন্তু মঙ্গলবার্তা নামে কলকাতা হতে মুদ্রিত ক্যাথলিক ইঞ্জিলের (নবসন্ধি) শেষে সাম সঙ্গীত নামে এই যবুর কিতাবটি সংযুক্ত আছে। সেখানে ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, 'সাম সঙ্গীত রচয়িতাদের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানা নেই!'

বাইবেলের অন্যান্য সুসমাচার প্রসঙ্গে

ইউশা আলাইহিস সালামকে ষষ্ঠ গ্রন্থটির লেখক বলা হয়। কিন্তু এতেও তার নিজের মৃত্যু ও দাফন করার স্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই স্পষ্টই বোঝা যায়, এ গ্রন্থটিও অজানা কেউ লিখে তার নামে চালিয়ে দিয়েছে।

৭ নং গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'লেখক সম্ভবত হযরত শমূয়েল।' এর অর্থ হচ্ছে, এটাও অনিশ্চিত।

৮ থেকে ১২ এবং ১৭ ও ১৮ নং গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এগুলোর লেখকের নাম জানা যায়নি।' ১৩ থেকে ১৬ নং পর্যন্ত গ্রন্থগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'লেখক সম্ভবত হযরত উযায়ের আলাইহিস সালাম।' আর অবশিষ্ট গ্রন্থগুলো যাদের নামে, তাদেরকেই

লেখক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এগুলোর লেখকও হয় অজ্ঞাতনামা, নতুবা অনিশ্চিত।

যুক্তির আলোকে বাইবেল প্রসঙ্গ

কোরআন-হাদীস এবং বাইবেলের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণের আলোকে এ বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে খ্রিস্টান সমাজে প্রচলিত বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দাস আল্লাহর নাজিলকৃত তাওরাত বা ইঞ্জিল কিংবা যবুর কোনোটাই নয়, বরং তা মানবরচিত কিছু পুস্তিকার সংকলন মাত্র। যুক্তি ও বিবেচনার দৃষ্টিকোণ থেকেও এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

১. যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া হয় যে, খ্রিস্টানরা তাদের বাইবেলের মধ্যকার প্রচলিত তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুর-এর লেখক হিসেবে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, উল্লিখিত ব্যক্তিরাই সংশ্লিষ্ট পুস্তকগুলো রচনা করেছেন, তবে তার পরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, মনুষ্য রচিত গ্রন্থ কিভাবে আসমানী কিতাব হতে পারে?

২. বর্তমান বাইবেলে মোটামুটি তিন প্রকারের বাণী পাওয়া যায়।

(ক) আল্লাহর বাণী।

(খ) নবীর বাণী।

(গ) আল্লাহ ও নবী ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির বাণী।

কিন্তু অনুপাত হিসেবে সেখানে আল্লাহ ও নবীর বাণীর চেয়ে অন্য লোকদের বাণীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যহারে বেশি। সুতরাং এ কারণে বাইবেলকে 'আল্লাহর কিতাব' বলার পরিবর্তে সাধারণ গ্রন্থ সাব্যস্ত করা ছাড়া উপায় নেই। নিম্নে কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা হলো।

(ক) "কিন্তু পিতর এগারো জনের সহিত দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিয়া কহিলেন "হে ইসরায়েলিরা, এই সকল কথা শোনো। নাসরতীয় যিশু পরাক্রমকার্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর-কর্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেরাই জানো;" (প্রেরিত ২:১৪, ২২)[২২]

(খ) "আর শলোমন তেরো বছর আপন বাটী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত থাকিলেন; পরে আপনার সমুদয় বাটীর নির্ম্মাণ সমাপন করিলেন। আর তিনি লিবানোন অরণ্যের বাটী নির্মাণ করিলেন; তাহার দীর্ঘতা এক শত হস্ত, প্রস্থ পঞ্চাশ হস্ত ও উচ্চতা ত্রিশ হস্ত ছিল, তাহা চারি শ্রেণী এরসকাষ্ঠের স্তম্ভের ওপরে স্থাপিত এবং স্তম্ভগুলির ওপরে এরসকাষ্ঠের কড়ি বসানো ছিল।" (১ রাজাবলী ৭:১-২)[২৩]

(গ) "তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎ-পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশির বয়স এক শত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই, ও তাঁহার তেজও হ্রাস হয় নাই। পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির নিমিত্ত মোয়াবের তলভূমিতে ত্রিশ দিন রোদন করিল; এইরূপে মোশির শোকে তাহাদের রোদনের দিন সম্পূর্ণ হইল।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৫-৮)[২৪]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলো বক্তারূপে আল্লাহ বা কোনো নবীকে নির্দেশ করে না, বরং তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে বোঝায়, যিনি দেখে অথবা শুনে অথবা নিজে এরূপ ভেবে এগুলো রচনা করেছেন। বস্তুত প্রত্যক্ষদর্শী বা শ্রোতার কিছু কিছু বাণীকে বাদ দিয়ে বাইবেলের অধিকাংশ পাঠই জনশ্রুতি থেকে লিখিত ইতিহাস।

জেরুজালেমের বাইবেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফাদার ডি. ভো (de Vaux) ১৯৬২ সালে লিখিত আদি পুস্তকের ফরাসি অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন,

It was in the Sixteenth century that Calstadt noted that Moses could not have written the account of his own death in Deuteronomy (৩৪:৫-১২).

ষোড়শ শতাব্দীতে কালস্ট্যাট যুক্তি পেশ করে বলেন, এই দ্বিতীয় বিবরণে (৩৪:৫-১২) হযরত মুসার মৃত্যুর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা হযরত মুসার নিজের পক্ষে রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়।[২৫]

এ ছাড়া পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তিকার মধ্যে সাত শতেরও অধিক এমন বিবরণ রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ এসব পুস্তিকার অবতীর্ণকারী তো নন-ই, এমনকি হযরত মুসা আলাইহিস সালামও এগুলোর লেখক ছিলেন না।

এতে দেখা যাচ্ছে, বাইবেলের অধিকাংশ পাঠই অন্য লোকদের বর্ণিত পরোক্ষ বিবরণী। সেই তুলনায় সেখানে আল্লাহ ও নবীর বাণীকে খুবই সামান্য বলা যায়। অথচ খ্রিস্টানরা জেনে-বুঝেও এই সব কিছুকে একই মলাটের নিচে একই বাইবেলে সংকলন করে 'ঈশ্বরের বাণী' বলে চালিয়ে দিচ্ছে। এ দিকেই ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে বলা হয়েছে–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ

"তারা কিতাব লেখে নিজেদের হাতে, তারপর বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট

থেকে আসা বাণী...।" (সূরা বাকারা : আয়াত নং-৭৯)

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা বোঝা গেল, বর্তমানে ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মের মৌলিক ধর্মগ্রন্থ বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং মূল ধর্মগ্রন্থরূপে একমাত্র কোরআন অবিকৃত রয়েছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি নাজিলকৃত পবিত্র কোরআনই এ উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র পালনীয় কিতাব এবং কোরআনের প্রদর্শিত ইসলামই একমাত্র পালনীয় ধর্ম, তাই মহান আল্লাহ হাফেযগণের মাধ্যমে কুদরতীভাবে এ কিতাবের হেফাযত করেছেন। বস্তুত এটা মহান আল্লাহরই কারিশমা। আর এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমিই এ যিক্‌রগ্রন্থ (কোরআন) নাজিল করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর হেফাযতকারী।" (সূরা হিজর : আয়াত নং ৯)

তাই পবিত্র কোরআনকেই বর্তমান বিশ্ববাসীর জন্য একমাত্র ধর্মগ্রন্থরূপে এবং ইসলামকে একমাত্র দ্বীনরূপে মেনে চলা কর্তব্য; অন্য কোনো কিতাব বা অন্য কোনো ধর্ম নয়।

---

১. নবী-রাসূল থেকে কে বা কারা গ্রন্থটিকে লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মৌখিক শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, অতঃপর তাঁদের থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন–এভাবে বর্তমান বর্ণনাকারী পর্যন্ত তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকবে এবং সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সুপরিচিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজ নিজ যুগে স্বীকৃত হতে হবে, যাদের বুদ্ধি, বিশ্বস্ততা, সততা ও ধার্মিকতা হবে প্রশ্নাতীত।

২. 5 So Moses the servant of the Lord died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. 6 And He buried him in a valley in the land of Moab, opposite Beth Peor; but no one knows his grave to this day. 7 Moses was one hundred and twenty years old when he died. His eyes were not dim nor his natural vigor diminished. 8 And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days. So the days of weeping and mourning for Moses ended. (Deuteronomy 34:5-8;NKJV)

৩. দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:১০-১১

৪. ইহুদিদের বিস্তারিত ইতিহাস জানার জন্য দেখুন ইহুদি ঐতিহাসিক 'শাহিন বেক ম্যকারিয়াস' কৃত আরবী ইতিহাস গ্রন্থ 'তারীখুল ইসরাইলিয়্যীন' (প্রকাশ : মিসর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ)

৫. ১ রাজাবলী ১৫: ২৫-২৬, তারীখুল ইসরাইলিয়ীন : পৃ. ২৫-২৬

৬. হযরত দাউদ (আ.) সম্ভাব্য খ্রিস্টপূর্ব ১০১০ অব্দে ফিলিস্তিনে বনী ইসরায়েলের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন।

৭. এ সকল বিষয় ২ রাজাবলী ২২:৩-১১ এবং ২ বংশাবলী ৩৪:১৪-১৯ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. 1 Now it came to pass in the ninth year of his reign, in the tenth month, on the tenth day of the month, that Nebuchadnezzar king of Babylon and all his army came against Jerusalem and encamped against it; and they built a siege wall against it all around. 2 So the city was besieged until the eleventh year of King Zedekiah. (2 Kings 25:1-2;NKJV)

বাদশাহ বুখতে নসরের হামলার বিবরণের জন্য পাঠক আরো দেখুন : (Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book VIII, ch. 6-8)

৯. সূরা বনী ইসরায়েলে : ৫-৭, আল্লাহ তা'আলা ইহুদি জাতির ওপর দুটি হামলার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মতে, প্রথম হামলার নায়ক ছিল সম্রাট দ্বিতীয় বুখতে নাস্‌সার (Nebuchadnezzar II) খ্রিস্টপূর্ব সম্ভাব্য ৫৮৬ অব্দে। আর দ্বিতীয় হামলা সংঘটিত হয় রোমীয় সম্রাট এন্টিওকাস (Antiochus)-এর মাধ্যম খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ অব্দে। তবে কারো কারো মতে–প্রথম হামলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুসা আলাইহিস সালামের পর থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত সকল হামলা এবং দ্বিতীয় হামলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঈসা আলাইহিস সালামের পর থেকে আখেরী নবীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নির্যাতনসমূহ। এ ব্যাপারে ভিন্ন কিছু মতও রয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী : সূরা বনী ইসরায়েল : ৫-৭ ও মা'আরিফুল কোরআন (মুফতী শফী রহ. কৃত) : সূরা বনী ইসরায়েল : ৫-৭)

১০. এন্টিওকাসের (Antiochus) আক্রমণের বিবরণের জন্য পাঠক আরো দেখুন; Encyclopedia Brittanica (15th Edition; U.S.A. 1990) ২২/৪১০

সম্রাট এন্টিওকাসের (Antiochus)-এর হামলার পরও বেশ কয়েকবার ইহুদিরা গণহত্যা এবং নিধনের শিকার হয়। এর মধ্যে ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট টাইটাস (Titus)-এর আগ্রাসন এবং ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হেডরিয়ান Hadrian (117-138 CE)-এর আগ্রাসন অন্যতম। (Titus)-এর পক্ষ হতে ইহুদিরা ভয়াবহ হামলার শিকার হয়। হাজার হাজার ইহুদিকে এ সময় সে হত্যা করে এবং তাদের বড় একটি অংশকে বন্দি করে। সম্রাট Hadrian-এর

আগ্রাসনও ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। এ সময় তিনি ব্যাপকভাবে ইহুদি নিধন করার পাশাপাশি Jerusalem (জেরুজালেম) শহরকে ধ্বংস করে দিয়ে ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হতে তাড়িয়ে দেন এবং এ শহরে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। ইহুদি মুক্ত করে তিনি এখানে রোমীয় দেবতা 'জুপিটার'-এর উপাসনালয় তৈরি করেন। (Encyclopedia Brittanica (15th Edition; USA 1990) ২২/৪১৬, ডা. মাহমূদ আব্দুর রহমান কৃত মুযিযু তারীখিল ইয়াহুদ ওয়ার্ রদ্দি আলা মাযায়িমিহিমিল বাতিলাহ : পৃ. ২৬০)

ইহুদি ঐতিহাসিক শাহীন ম্যাকরিয়াস বলেন :

এ সময়েই (তথা জেরুজালেম ধ্বংসের পর) ইসরায়েলিদের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে। জেরুজালেমের ধ্বংসের পর ইহুদিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে সে সকল দেশেই তাদের ইতিহাস রচিত হয়, যেখানে তারা আবাস গড়েছিল। নির্বাসিত সময়ে তারা বিভিন্ন নির্যাতন এবং নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। কেননা, (ফিলিস্তিনের দখলদার) রোমানরা তাদেরকে জেরুজালেমে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। (তারীখুল ইসরাইলিয়ীন : ৭৭)

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বিভিন্ন বাদশাহর উপর্যুপরি আক্রমণ এবং আগ্রাসনের দরুন ইহুদিদের সহাবস্থান অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পারসিকদের শাসনামলে ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর সহাবস্থানের আংশিক পরিবেশ তৈরি হলেও এ পর্যায়ে এসে তা পুরোপুরি ধসে পরে। ফলে ইহুদিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিছু তো রয়ে গিয়েছিল ব্যাবিলনে আর অবশিষ্টরা আরব, ইংল্যান্ড, জার্মানি, স্পেন, ইতালি, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, লাঞ্ছনা এবং অপদস্থতার ছায়া এসব দেশেও তাদের পিছু ছাড়েনি। (তারীখুল ইসরাইলিয়ীন : ৮১-৯৫)

এই তাণ্ডব, গণহত্যা এবং পলায়নরত অবস্থায় ইহুদিদের পক্ষে তাওরাত সংরক্ষণ করা কিভাবে সম্ভবপর ছিল? উপরন্তু মুসলমানরা যেভাবে কোরআনে কারীমের হাফেয হয় এবং আল্লাহ তা'আলা কোরআনকে যেভাবে মানুষের হৃদয়ে সংরক্ষণ করেছেন, তাওরাত সংরক্ষণের ব্যবস্থা তেমন ছিল না। বর্তমান ইহুদি জাতির প্রতি তাকালেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুরো পৃথিবীতে তাওরাত বলে খ্যাত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যে কয়জন 'হাফেয' পাওয়া যাবে, পৃথিবীর একটি ছোট্ট মুসলিম দেশ বাংলাদেশের ছোট একটি জেলার ক্ষুদ্র একটি গ্রামেও তার চেয়ে বেশিসংখ্যক কোরআনে কারীমের হাফেয পাওয়া যাবে। কাজেই তাওরাতের লিখিত কপি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর স্মৃতিশক্তি থেকে তাওরাত সংকলনের কথাও চিন্তা করা যায় না!

১১. Bucaille,The Bible, The QurOan, and Science, 54.

১২. 2 Now the names of the twelve apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; 3 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus; 4 Simon the Cananite,and Judas Iscariot, who also betrayed Him. (Matthew 10:2-4;NKJV)

১৩ And when it was day, He called His disciples to Himself; and from them He chose twelve whom He also named apostles: 14 Simon, whom He also named Peter, and Andrew his brother; James and John; Philip and Bartholomew; 15 Matthew and Thomas; James the son of Alphaeus, and Simon called the Zealot; 16 Judas the son of James, and Judas Iscariot who also became a traitor. (Luke 6:13-16;NKJV)

১৩. 24 This is the disciple who testifies of these things, and wrote these things; and we know that his testimony is true. 25 And there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. (John 21:24-25;NKJV)

১৪. 12 But to the rest I, not the Lord, say: If any brother has a wife who does not believe, and she is willing to live with him, let him not divorce her. 25 Now concerning virgins: I have no commandment from the Lord; yet I give judgment as one whom the Lord in His mercy has made trustworthy. (1 Corinthians 7:12,25;NKJV)

১৫. মথি ১:১-১৬ ও লূক 3:23-38,1 The book of the genealogy of Jesus Christ, the Son of David, the Son of Abraham: 2 Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judah and his brothers. 3 Judah begot Perez and Zerah by Tamar, Perez begot Hezron, and Hezron begot Ram. 4 Ram begot Amminadab, Amminadab begot Nahshon, and Nahshon begot Salmon. 5 Salmon begot Boaz by Rahab, Boaz begot Obed by Ruth, Obed begot Jesse, 6 and Jesse begot David the king. David the king begot Solomon by her who had been the wife of

Uriah. 7 Solomon begot Rehoboam, Rehoboam begot Abijah, and Abijah begot Asa. 8 Asa begot Jehoshaphat, Jehoshaphat begot Joram, and Joram begot Uzziah. 9 Uzziah begot Jotham, Jotham begot Ahaz, and Ahaz begot Hezekiah. 10 Hezekiah begot Manasseh, Manasseh begot Amon, and Amon begot Josiah. 11 Josiah begot Jeconiah and his brothers about the time they were carried away to Babylon. 12 And after they were brought to Babylon, Jeconiah begot Shealtiel, and Shealtiel begot Zerubbabel. 13 Zerubbabel begot Abiud, Abiud begot Eliakim, and Eliakim begot Azor. 14 Azor begot Zadok, Zadok begot Achim, and Achim begot Eliud. 15 Eliud begot Eleazar, Eleazar begot Matthan, and Matthan begot Jacob. 16 And Jacob begot Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus who is called Christ. (Matthew 1:1-16;NKJV)

23 Now Jesus Himself began His ministry at about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, the son of Heli, 24 the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Janna, the son of Joseph, 25 the son of Mattathiah, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai, 26 the son of Maath, the son of Mattathiah, the son of Semei, the son of Joseph, the son of Judah, 27 the son of Joannas, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri, 28 the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er, 29 the son of Jose, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi, 30 the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim, 31 the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattathah, the son of Nathan, the son of David, 32 the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon, 33 the son of Amminadab, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah, 34 the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, 35 the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah, 36 the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech, 37 the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalalel, the son of Cainan, 38 the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. (Luke 3:23-38;NKJV)

১৬. 6 And the Lord passed before him and proclaimed, ÒThe Lord, the Lord God, merciful and gracious, longsuffering, and abounding in goodness and truth, 7 keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the childrenOs children to the third and the fourth generation.Ó (Exodus 34:6-7;NKJV)

১৭. 24 Then Jacob was left alone; and a Man wrestled with him until the breaking of day. 25 Now when He saw that He did not prevail against him, He touched the socket of his hip; and the socket of JacobOs hip was out of joint as He wrestled with him. 26 And He said, ÒLet Me go, for the day breaks.Ó But he said, ÒI will not let You go unless You bless me!Ó 27 So He said to him, ÒWhat is your name?Ó He said, ÒJacob.Ó 28 And He said, ÒYour name shall no longer be called Jacob, but Israel; for you have struggled with God and with men, and have prevailed.Ó 29 Then Jacob asked, saying, ÒTell me Your name, I pray.Ó And He said, ÒWhy is it that you ask about My name?Ó And He blessed him there. 30 So Jacob called the name of the place Peniel: ÒFor I have seen God face to face, and my life is preserved.Ó (Genesis 32:24-30;NKJV)

১৮. আদিপুস্তক ১৯:৩১-৩৮, 31 Now the firstborn said to the younger, ÒOur father is old, and there is no man on the earth to come in to us as is the custom of all the earth. 32 Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve the lineage of our father.Ó 33 So they made their father drink wine that night. And the firstborn went in and lay with her father, and he did

not know when she lay down or when she arose. 34 It happened on the next day that the firstborn said to the younger, ÒIndeed I lay with my father last night; let us make him drink wine tonight also, and you go in and lie with him, that we may preserve the lineage of our father.Ó 35 Then they made their father drink wine that night also. And the younger arose and lay with him, and he did not know when she lay down or when she arose. 36 Thus both the daughters of Lot were with child by their father. 37 The firstborn bore a son and called his name Moab; he is the father of the Moabites to this day. 38 And the younger, she also bore a son and called his name Ben-Ammi; he is the father of the people of Ammon to this day. (Genesis 19:31-38;NKJV)

১৯. আদি পুস্তক ৯:২০-২১, 20 And Noah began to be a farmer, and he planted a vineyard. 21 Then he drank of the wine and was drunk, and became uncovered in his tent. (Genesis 9:20-21;NKJV)

২০. 20 And Noah began to be a farmer, and he planted a vineyard. 21 Then he drank of the wine and was drunk, and became uncovered in his tent. 22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brothers outside. 23 But Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned away, and they did not see their fatherOs nakedness. 24 So Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done to him. 25 Then he said: ÒCursed be Canaan; A servant of servants, He shall be to his brethren.Ó (Genesis 9:20-25;NKJV)

২১. 2 Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the kingOs house. And from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. 3 So David sent and inquired about the woman. And someone said, ÒIs this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?Ó 4 Then David sent messengers, and took her; and she came to him, and he lay with her, for she was cleansed from her impurity; and she returned to her house. 5 And the woman conceived; so she sent and told David, and said, ÒI am with child.Ó 14 In the morning it happened that David wrote a letter to Joab and sent it by the hand of Uriah. 15 And he wrote in the letter, saying, ÒSet Uriah in the forefront of the hottest battle, and retreat from him, that he may be struck down and die.Ó 16 So it was, while Joab besieged the city, that he assigned Uriah to a place where he knew there were valiant men. 17 Then the men of the city came out and fought with Joab. And some of the people of the servants of David fell; and Uriah the Hittite died also. (2 Samuel 11:2-5,14-17;NKJV)

২২. 14 But Peter, standing up with the eleven, raised his voice and said to them, ÒMen of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. 22 ÒMen of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a Man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through Him in your midst, as you yourselves also know. Ó (Acts 2:14,22;NKJV)

২৩. 1 But Solomon took thirteen years to build his own house; so he finished all his house. 2 He also built the House of the Forest of Lebanon; its length was one hundred cubits, its width fifty cubits, and its height thirty cubits, with four rows of cedar pillars, and cedar beams on the pillars. (1 Kings 7:1-2;NKJV)

২৪. 5 So Moses the servant of the Lord died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. 6 And He buried him in a valley in the land of Moab, opposite Beth Peor; but no one knows his grave to this day. 7 Moses was one hundred and twenty years old when he died. His eyes were not dim nor his natural vigor diminished. 8 And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab thirty days. So the days of weeping and mourning for Moses ended. (Deuteronomy 34:5-8;NKJV)

২৫. Bucaille, The Bible, The QurOan, and Science, 16.

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :

মাওলানা মাহমুদুল হাসান

তাবলীগ জামা'আতের সংকট ও আমাদের করণীয়

শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হালীম বোখারী

(গত ১৬ জুলাই ২০১৮ ইং সোমবার বাদে আসর আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায়, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা তাবলীগী জোড় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জোড়ে দিকনির্দেশনামূলক নসীহত পেশ করেন আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান পরিচালক শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালিম বোখারী হাফিযাহুল্লাহ।)

হামদ সালাতের পর তিনি বলেন, আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দেওবন্দি মতাদর্শের বিশ্বাসী হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এই জন্য সকলের উচিত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দু'আ করা, আল্লাহ যেন এই মতাদর্শের ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করেন, আমীন।

'দেওবন্দিয়্যাত' একটি মতাদর্শ :

বর্তমান পৃথিবীতে বিভন্ন মতাদর্শ রয়েছে। তেমনি আমাদের 'দেওবন্দিয়্যাত'ও একটি মতাদর্শের নাম। 'দেওবন্দিয়্যাত'-এর কথা কোরআন-সুন্নায় রয়েছে। আকায়েদের কিতাবেও আছে। তবে ভিন্ন নামে আছে। যেমন–আমাদের সাতকানিয়ায় একটি এলাকা আছে চরম্বা। সেখানে মুরগির ডিমকে বলে 'বজা' আর আমিরাবাদে বলা হয় 'আণ্ডা' তবে যখন শহরে আসে তখন হয়ে যায় ডিম। তেমিন 'দেওবন্দিয়্যাত' এই মতবাদটি কোরআন-সুন্নাহ থেকে নির্গত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম' সরল পথ কামনা করো। সেই সরল পথের কথা রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী।' ফুকাহায়ে কিরাম তার ব্যাখ্যা করেছেন 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।' আর এই সরল পথ ভারত উপমহাদেশে 'দেওবন্দিয়্যাত'-এর নামেই পরিচিত।

তদানীন্তন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়ব (রহ.) 'দেওবন্দিয়্যাত'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

دینًا مسلمان ہے، فرقۃً اہل سنت والجماعۃ ہے، مذھبًا حنفی ہے، مشربًا صوفی ہے، عقیدۃً ماتردی ہے، سلوکًا چستی ہے بلکہ جامع السلاسل ہیں، فکرًا اولی اللہی ہے، اصولاً قاسمی ہے، فروعًا گنگوہی ہے اور نسبۃ دیوبندی ہے۔

অর্থাৎ 'দেওবন্দিয়্যাত' এই মতাদর্শের ধর্ম হলো ইসলাম। দল হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। তারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও সুফি মতবাদে বিশ্বাসী। ইমাম আবুল মানুসুর মাতুরদীর আকীদায় বিশ্বাসী। আধ্যাত্মিকতায় চিশতী। বরং কাদেরী, সাহরাওয়ার্দী, নকশবন্দী ও চিশতিয়া চার তরিকার সমন্বয়কারী। শাহ ওলি উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)-এর চেতনায় এবং কাসেম নানুতভী (রহ.)-এর মৌলিক নীতিমালা ও শাখাগত দিকগুলোর ক্ষেত্রে মুফতী রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.)-এর অনুসারী। নিসবত হিসেবে দেওবন্দি, অর্থাৎ এই সকল কাজ চলে দেওবন্দ নামক স্থানে।

তাহলে বোঝা যায়, কোরআনে কারীমে যা 'সিরাতে মুস্তাকীম' সুন্নাতে রাসূলে যা 'মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী' আকীদার কিতাবে যা 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' সেটিই হিন্দুস্তানে 'দেওবন্দিয়্যাত'।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'দারুল উলূম দেওবন্দ' :

দেওবন্দে একটি প্রতিষ্ঠান আছে 'দারুল উলূম দেওবন্দ'। রাসূল (সা.) তার প্রতিষ্ঠাতা। এটি প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে মুহতামিম সাহেব (রহ.) স্বপ্ন দেখেন রাসূল (সা.) মাদরাসার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে মাদরাসার এরিয়া দেখে বলেন, এই জায়গাটি মাদরাসার জন্য ছোট হবে। তিনি নিজেই একটি এরিয়া এঁকে দেন। সকলে ওই স্থানে লাঠির চিহ্ন দেখতে পান। পরে ওই নকশার ওপরই মাদরাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

'দারুল উলূম দেওবন্দের' প্রধান মিশন :

সূচনালগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠান সকল বাতিলের মোকাবেলা করে আসছে। ইহুদিবাদের মোকাবেলা করেছে। খ্রিস্টবাদের মোকাবেলা করেছে। আরিয়া সমাজ, কাদিয়ানী মতবাদ, সালাফী মতবাদ, বেরলভী মতবাদসহ সকল বাতিলের প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। এই জন্যই বাতিলরা সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টায় থাকে এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে দিতে। অনেক চেষ্টা তারা চালিয়েছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আল্লাহ তাদের সকল চক্রান্তকে 'فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ' করে দেন।

کہسار یہاں دب جاتے ہیں
طوفان یہاں رک جاتے ہیں
اس کاخ فقیری کے آگے
شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

পাহাড় এখানে ধসে যায়, ঘূর্ণিঝড় এখানে থেমে যায়,

এই গরিবখানার সামনে রাজপ্রাসাদও

ঝুঁকে যায়।

দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর ঘরে একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল নেহরু এলেন। হুজুর স্বাভাবিকভাবে বসলেন আর তিনি দুই জানু হয়ে বসলেন। এটিই হলো দারুল উলূম দেওবন্দের শান!

কাদিয়ানীর মোকাবেলা করার জন্য বের হয়েছেন দেওবন্দের সন্তানরা। আল্লামা আতাউল্লাহ শাহ বোখারী, আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.)। তাসাউফকে সংস্কার করেছেন দেওবন্দের আরেক সন্তান হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)। ইংরেজ বেনিয়াদের থেকে এ দেশকে মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন দেওবন্দের সন্তান শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমূদ হাসান দেওবন্দি (রহ.)।

'দারুল উলূম দেওবন্দ' হকের টাওয়ার :

মূলত এটি হলো হকের টাওয়ার। এই টাওয়ারের ওপর যুগ যুগ ধরে হামলা চলে আসছে। তবে আল্লাহ এটির মূল রক্ষাকর্তা, তিনিই এটিকে রক্ষা করবেন কিয়ামত পর্যন্ত ইনশা আল্লাহ। এই হকের টাওয়ারে আজকে একটি অ্যাটম বোমা মারা হয়েছে। ভারত উপমহাদেশ, আরব-আজম, আফ্রিকা-আমেরিকাসহ গোটা বিশ্বে তার প্রভাব পড়েছে। সেই অ্যাটম বোমা হলো, "বেতন-ভাতা নিয়ে যাঁরা মাদরাসায় পড়ান তাঁদের চেয়ে ব্যভিচারী মহিলা অনেক উত্তম!"

নাউযুবিল্লাহ।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, তখনকার যুগে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগার থেকে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদরাসার মুয়াল্লিমদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হতো। সেই যুগে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কোরআন পড়িয়ে, হাদীস পড়িয়ে বেতন নেওয়া জায়েয হবে না। পরবর্তী সময়ে ইসলামী শাসনব্যবস্থাও নেই, বায়তুল মালও নেই। তখন সকল উলামায়ে কেরাম ইজমা বা ঐকমত্য হয়ে ঘোষণা দেন যে বেতন-ভাতা ছাড়া যেহেতু এই কাজগুলো চলতে পারে না, তাই মাদরাসা-মক্তব রক্ষার স্বার্থে শিক্ষকতা, ইমামতি করে বেতন গ্রহণ করা জায়েয আছে। ফাতওয়ায়ে শামী, এমদাদুল ফাতাওয়া, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূমসহ সকল ফতোয়ার কিতাবে তা স্পষ্ট লেখা আছে। মূলত এই কথার মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে চেষ্টা চালানো হচ্ছে যেন মাদরাসা বন্ধ করা যায়। যেমনি কাফির-মুশরিক ও নাস্তিক-মুরতাদরা চাচ্ছে মাদরাসা বন্ধ হয়ে যাওয়াটা।

সংকট নিরসনে আমাদের করণীয় :

এ পরিস্থিতিতে আমারা কী করব? আমরা কি লাঠি নিয়ে মারামারি করব? না, আমরা লাঠি নিয়ে মারামারি করব না। এই সংকট থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হলে আমাদেরকে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এক. আমাদেরকে বেশি বেশি করে দু'আ করতে হবে।

যেমন–আপনাদেরকে স্পেনের একটি কাহিনী শোনাচ্ছি।

স্পেনে একজন অনেক বড় আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ লোক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আব্দুল্লাহ আন্দুলসী। হাজার হাজার মুরিদ ছিল তাঁর। একদা তিনি এক মূর্তিপূজককে দেখে আত্ম অহংকারী হয়ে মনে মনে বলেন, আমি এই মূর্তিপূজারীর চেয়ে অনেক ভালো। আমি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। তাঁর এই আত্মগৌরবপূর্ণ কথা আল্লাহর পছন্দ হয়নি। তাই আল্লাহ তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন। একদিন তিনি মুরিদগণকে নিয়ে সফর করেন। এমন সময় এক খ্রিস্টান সুন্দরী মহিলা রাস্তার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পান। ওই বুজুর্গের দৃষ্টি সুন্দরী মহিলার প্রতি পড়ার সাথে সাথেই তিনি মহিলার প্রেমে পাগল হয়ে গেলেন। মুরিদদের বলেন, তোমরা চলে যাও। আর তিনি ওই সুন্দরী মহিলার পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। সুন্দরী মহিলার পিতা তাঁকে বলেন, দুই শর্তে আমার মেয়েকে তোমার নিকট বিয়ে দিতে পারি। এক, তোমাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। দুই, আমার কিছু শূকর আছে তা চড়াতে হবে। তিনি উভয় শর্ত মেনে নিয়ে ওই সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করলেন। মুরিদরা মুরশিদের জন্য কান্নাকাটি করতে লাগলেন। দীর্ঘদিন পর আল্লাহ তাঁদের দু'আ কবুল করলেন। ওই পীর সাহেব হুঁশ ফিরে পেলেন। তিনি সব কিছু ছেড়ে পুনরায় নিজের খানকায় ফিরে এলেন এবং ওই খ্রিস্টান মহিলাও ইসলাম ধর্ম কবুল করে নিলেন।

তেমনি আমাদেরকেও আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হয়ে বেশি বেশি কান্নাকাটি করতে হবে। যিনি এই কথাগুলো বলেছেন এবং যাঁরাই তাঁর পক্ষাবলম্বন করেছেন তাঁদের হিদায়াতের জন্য এবং আমাদের নিজেদের হিদায়াতের জন্য বেশি বেশি দু'আয় মশগুল থাকতে হবে। আমরা আল্লাহকে বলব, হে আল্লাহ! যারা বুঝতেছে না, যারা দেওবন্দের এই টাওয়ারে হামলা করতে চায় তাদেরকে হিদায়াত দান করুন। এভাবে যদি আমরা দু'আ করতে থাকি তাহলে অচিরেই যারা বুঝতেছে না তারাও ওই মহিলার মতো মুসলমান হয়ে ফিরে আসবে, ইনশা আল্লাহ। লাঠি নিয়ে মারামারি করে এই সমস্যার সমাধান কখনো সম্ভব নয়। আমি সেদিন কক্সবাজারে গিয়ে শুনলাম সেখানে একজন এসে বয়ান করছেন, অন্য দলের লোকজন তাঁকে বাহির করে দেয়

এবং মিম্বারটি বাহিরে নিয়ে বড় দা দিয়ে টুকরা টুকরা করে দেয়, আহা!।

তাবলীগি জামা'আত তো একটি আদর্শ জামা'আত ছিল। ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার নজিরবিহীন একটি জামা'আত ছিল। সেই জামা'আতের আজ এই দুরবস্থা! সত্যিই আমাদেরকে এই পরিস্থিতি খুবই কষ্ট দেয়। আল্লাহ রক্ষা করুন। আমাদের অনেক আকাবীরগণ বলেছেন, ইমাম মাহদী (আ.) এসে যে হক দলের সাথে যোগদান করবেন তা হলো তাবলীগ জামা'আত। কিন্তু আফসোস, আজ সেই জামা'আতের এই করুণ দশা! আল্লাহ হেফাজত করুন।

মূলত আমাদের মনে রাখতে হবে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। হয়তো আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করছেন যে তোমরা কি ব্যক্তি বিশেষের কারণে তাবলীগ করছ? আমরা বলব–না, আমরা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কারণে নয়, একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তাবলীগ করে থাকি।

আব্দুল্লাহ আব্দুলসী (রহ.) যখন খ্রিস্টান হয়ে গেছেন তখন তাঁর মুরিদগণ কি খ্রিস্টান হয়ে গেছেন? না, তাঁর মুরিদগণ খ্রিস্টান হননি। বরং তাঁরা আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে দু'আয় মশগুল ছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা আব্দুল্লাহ আব্দুলসীকেও হিদায়াত দান করেছেন এবং ওই মহিলাকেও হিদায়াত দান করেছেন। তেমনি এখনো যদি আমরা সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর দরবারে দু'আয় মশগুল থাকি তাহলে ইনশা আল্লাহ তাঁদেরকে আবারও আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেবেন।

দুই. এই দাওয়াতে তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দেওবন্দের সন্তান হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)। তাঁর লিখিত নীতিমালা অনুসরণ করে আমরা তাবলীগি কাজ চালিয়ে যাব।

তিন. আমাদের মূল পরিচয় হলো, 'দেওবন্দিয়্যাত'। তাই দেওবন্দের সিদ্ধান্ত মেনেই তাবলীগি কাজ অব্যাহত রাখব।

চার. ব্যক্তিগতভাবে সাথীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব। মারামারি ও ঝগড়াঝাঁটি করে রাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করব না। বরং বেশি বেশি করে দু'আ করব। মনে রাখবেন, হযরত উমর (রা.)-এর হিদায়াত কিন্তু দু'আর মাধ্যমেই হয়েছিল। আল্লাহ আমাদের সকলকে হিদায়াত দান করুন। যাঁরা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের সাথে লেগে আছেন তাঁদের সকলকে হিদায়াত দান করুন, আমীন।

বিন্যাস ও গ্রন্থনা :
মুফতী মুহাম্মদ সলীম মাহাদী

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪
বিকাশ : ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭, রকেট : ০১৮৩৮৪২৪৬৪৭-৯

জোহর ও আসর নামাযের সঠিক ওয়াক্ত

মুফতী রফিকুল ইসলাম আল মাদানী

সূর্য হেলার পর থেকে জোহর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। প্রত্যেক বস্তুর ছায়া নিজস্ব ছায়া ব্যতীত, দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের শেষ ওয়াক্ত থাকে। আর জোহরের ওয়াক্ত সমাপ্ত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের নামাযের ওয়াক্ত। উদাহরণস্বরূপ–আপনি এক ফুট একটি কাঠি নিয়ে ঠিক মধ্যাহ্নে এর ছায়া পেলেন এক ইঞ্চি পরিমাণ। তাহলে এক ইঞ্চি হলো তার নিজস্ব ছায়া। এবার লক্ষ করবেন, ধীরে ধীরে এর ছায়া বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যখনই ছায়া বৃদ্ধি পাবে, তখন থেকেই শুরু হবে জোহরের ওয়াক্ত। এমনিভাবে একসময় এর ছায়া দ্বিগুণে, অর্থাৎ দুই ফুট এক ইঞ্চিতে পৌঁছবে। তখন হলো জোহরের শেষ সময় এবং আসরের শুরু। (শরহুল মুহাযযাব, ৩/২৪)

কিন্তু জোহর নামাযের ক্ষেত্রে যদিও ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে তবে শীতকালে সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তির জন্য ছায়া এক গুণ হওয়ার পূর্বেই তথা অবিলম্বে পড়া (প্রাগুক্ত ৩/৫৪) এবং গরমকালে যথাসম্ভব বিলম্ব করে পড়া উত্তম। (প্রাগুক্ত ৩/৫৯ অবিলম্বে এ বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করা হবে।) অনুরূপভাবে আসরের নামাযের ক্ষেত্রে সূর্যাস্তের নিকটবর্তী হওয়ার আগে আগে পড়ে নেওয়া জরুরি। অন্যথায় নামায মাকরূহ হবে। আপনি নামাযের ওয়াক্ত নির্ণয়ের ব্যাপারে হয়তো সমস্যা মনে করছেন। আসলে সমস্যার কিছুই নেই দীর্ঘকাল যাবত উপরোল্লিখিত বর্ণনা মতে নামাযের সময়সূচি সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে। তাই নির্ভরযোগ্য একটি ক্যালেন্ডার ব্যবস্থা করাই আপনার জন্য আবশ্যক মাত্র। কিন্তু সতর্ক হতে হবে যে বর্তমানে নতুন নতুন মতবাদের কিছু লোক হাদীসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বলে থাকে যে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত, এক গুণ হওয়া মাত্রই জোহরের ওয়াক্ত শেষ হবে এবং তখনই আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হবে। তাই লক্ষ করবেন, তারা জোহরের সময়েই আসর পড়ে থাকে। তাদের এ নতুন মতাদর্শ কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী। এ মর্মে আমি কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস পেশ করব। যাতে করে জোহর ও আসরের সঠিক সময়টি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিশুদ্ধ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার মুসলিম শরীফের কয়েকটি বর্ণনায় রয়েছে–

عن عبد الله بن عمرو أنه قال سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلاة فقال ...وقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، مالم يحضر العصر ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس.

"হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, মধ্যাহ্নে সূর্য হেলার পর থেকে আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে আর আসরের ওয়াক্ত থাকবে সূর্যাস্তের পূর্বে হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত।" (সহীহ মুসলিম : ১/২২৩, হা. ৬১২)

এ হাদীসে জোহরের প্রথম ওয়াক্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু জোহরের শেষ ওয়াক্তের নির্দিষ্ট সময় সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় না, বরং বলা হয়েছে যে জোহরের শেষ ওয়াক্ত আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত। অতএব জোহরের শেষ ওয়াক্ত চিহ্নিত করার জন্য আসরের প্রথম ওয়াক্ত আগে চিহ্নিত করতে হবে। তাই আমরা এখন আসরের প্রথম ওয়াক্ত নিয়ে আলোচনা করব–

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে' আবু হুরায়রা (রা.)-কে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরে তিনি বলেন–

صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك

"তোমার সমপরিমাণ ছায়া হলে জোহর নামায পড়বে এবং তোমার দ্বিগুণ হলে আসর নামায পড়ে নেবে।" (মুয়াত্বা মালিক, ১/৮ হা. ৯ মুহাম্মদ, ১/৪১ হা. ১ এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী ثقة নির্ভরযোগ্য, ইমাম ইবনে আরাবী আরিজাতুল আহওয়াজীতে এ হাদীসটিকে صحيح বিশুদ্ধ বলেছেন, ১/২১৮, ইমাম যারক্বানী আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত এ হাদীসটিকে مرفوع حكمى তথা রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে গণ্য করেছেন। ১/৩৭)

এ হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হতেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হবে। এ কথাই অন্য হাদীসে রয়েছে–

فأقام بالعصر والشمس مرتفعة

রাসূলুল্লাহ (সা.) যেদিন প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়েছিলেন, সেদিন আসরের নামায পড়েন সূর্যের আলো প্রখরিত থাকা অবস্থায়। (সহীহ মুসলিম, ১/২২৩ হা. ৬১৪ সহীহ।

এভাবে যতগুলো হাদীসে সূর্যের আলো প্রখরিত থাকা অবস্থায় আসর নামায পড়েছেন বলে উল্লেখ আছে এ সকল হাদীসের দ্বারা আসর নামায প্রথম

ওয়াক্তে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর পড়েছেন বলে বোঝা যায়।

অনেকে এ থেকে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক গুণ হলেই আসরের সময় শুরু হবে মনে করে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত সুদীর্ঘ একটি হাদীস পেশ করছি–

إنما بقائكم فيما سلف قبلكم من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن، فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين.....

"রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, পূর্বের উম্মতের তুলনায় তোমাদের আয়ু অতি কম, যেমন–আসর নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (সময় অন্যান্য নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় অতিস্বল্প)। ইহুদিদের তাওরাত কিতাব প্রদান করা হলে তারা ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কাজ করত অক্ষম হয়ে মাত্র এক এক ক্বিরাত পরিমাণ বিনিময় লাভ করে। আর খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল কিতাব প্রধান করা হলে তারা জোহর থেকে আসর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় কাজকরত অক্ষম হয়ে মাত্র এক এক ক্বিরাত পরিমাণ বিনিময় লাভ করে। অতঃপর আমাদেরকে কোরআন প্রদান করা হলে আমরা মাত্র আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অল্প সময় আমল করত দুই দুই ক্বিরাত করে বিনিময় লাভ করি।" (সহীহ বোখারী ১/৭৯ হা. ৫৫৭। ক্বিরাত শব্দ বলে বড় ধরনের প্রতিদান বোঝানো হয়েছে। যার পরিমাণ আল্লাহই জানেন। বাংলা পরিভাষায় পাহাড় সমতুল্য বিনিময় বলা হয়। [হাসিয়া ১/৩০১] তাই এক ক্বিরাত মানে একটি পাহাড় পরিমাণ বিনিময়।)

এ হাদীসে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টা অন্যান্য নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের তুলনায় অতিস্বল্প বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষ করে লক্ষণীয় হলো, এ হাদীসের আলোকে জোহর হতে আসর পর্যন্ত সময়ের তুলনায় আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত সময়টা কম হবে বলে প্রমাণিত হয়। তাই আসরের নামায কমপক্ষে প্রতিটি বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পরই আদায় করতে হবে। এর পূর্বে তথা ছায়া এক গুণ হলে যদি আসর পড়া হয়, তাহলে ওপরের হাদীসের মর্মানুসারে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় স্বল্প হবে না, বরং অনেক দীর্ঘ হবে। আর জোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময় হবে অতিস্বল্প। তাই যারা আসরের প্রথম বা জোহরের শেষ ওয়াক্ত প্রতিটি বস্তুর এক গুণ ছায়াতেই হবে বলে, তাদের কথা ভুল। অতএব, বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া মূল ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হলে জোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে আসরের ওয়াক্ত শুরু হবে। আসরের এ প্রথম সময় সম্পর্কেই অন্য হাদীসে এসেছে–

أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس

রাসূলুল্লাহ (সা.) জোহরের নামায শেষ সময়ে তথা পূর্বের দিনে আসরের প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেন। (সহীহ মুসলিম ১/২২৩, হা. ৬১৪)। এ হাদীসে জোহরের শেষ ওয়াক্ত ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যে বহাল থাকে তা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল।

এ আলোচনার বিপরীতে কেউ কেউ জিব্রাইল (আ.)-এর ইমামতির হাদীস উল্লেখ করে থাকে। যাতে বলা হয়েছে যে,

فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله

"প্রত্যেক বস্তুর এক গুণ ছায়ার সময় আসর পড়েন।" (মুসনাদে আহমদ ২২/৪০৮, হা. ১৪৫৩৮ সহীহ।)

প্রত্যেক বস্তুর এক গুণ ছায়ার সময় আসর নামায পড়তে হবে এবং এর পক্ষে জিব্রাইল (আ.)-এর ইমামতির উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

মূলত এ হাদীসের সঠিক সমাধান নিম্নরূপ–

ক. উল্লিখিত হাদীসের পরের অংশে বলা হয়েছে যে,

ثم جاء ه في الغد، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه

"জিব্রাইল (আ.) পরের দিন এলেন, অতঃপর আসর নামায পড়ালেন যখন ছায়া দ্বিগুণ ছিল।" (মুসনাদে আহমদ, ২২/৪০৮, হা. ১৪৫৩৮ সহীহ)

উক্ত হাদীসের আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল যে প্রথমটি (এক গুণ ছায়া অবস্থায় নামায পড়ার বিষয়টি) রহিত হয়ে গেছে। বস্তুত সেটা ছিল নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কীয় প্রথম হাদীস।

খ. হাদীসের মধ্যে যে مثل শব্দ আছে, তা দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়ার সময়ে নামায পড়েছেন তা নয়, বরং তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিব্রাইল (আ.) এই সময়ে এসেছিলেন। যেমন–নাসাঈ শরীফে আছে–

فأتاه حين كان الظل مثل شخصه

"প্রত্যেক বস্তুর ছায়া যখন এক গুণ পরিমাণ হয় তখন তিনি আসেন।" (নাসাঈ ১/৬০, হা. ৫১২)। এর দ্বারা বোঝা গেল যে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়া এটা নামাযের সময় ছিল না, বরং জিব্রাইল (আ.)-এর আসার সময় ছিল। (ইলাউস সুনান ২/৫)। মূলত তিনি এ সময়ে এলেও অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা মতে তিনি ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর আসর আদায় করেন।

তাই এ হাদীসের আলোকে যারা প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক গুণ হলে বা জোহরের সময় আসর পড়ে তাদের কথায় কান লাগিয়ে প্রতারিত হবেন না।

গরম ও শীতকালে জোহরের নামাযের মুস্তাহাব সময়

নিম্নে আরো কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস পেশ করা হচ্ছে, যাতে গরমকালে জোহরের নামায বিলম্বে পড়ার তাগিদ করা হয়েছে।

সাহাবীয়ে রাসূল (সা.) আবুজর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত–

فى قال كنا مع رسول الله ﷺ سفرنا فأراد المؤذن أن يؤذن أبرد ثم للظهر فقال النبى ﷺ أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبى ﷺ إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

"আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে একদা ভ্রমণে ছিলাম, সে মুহূর্তে মুয়াজ্জিন জোহরের নামাযের আযান দেওয়ার প্রস্তুতি নিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "ঠাণ্ডা হতে দাও"।

কিছুক্ষণ পর মুয়াজ্জিন পুনরায় আযানের প্রস্তুতি নিলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বলেন, "ঠাণ্ডা হতে দাও"। এমনকি আমরা পাহাড়ের দীর্ঘ ছায়া দেখতে পাই, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, গরমের তীব্রতা দোযখের উত্তাপের কারণে হয়। অতএব তীব্র গরমকালে ঠাণ্ডা করে নামায পড়বে।"

(সহীহ বোখারী ১/৭৭, হা. ৫৩৯ সহীহ মুসলিম ১/২২৪, হা. ৬১৬)

হযরত আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রা.)সহ বেশ কয়েকজন সাহাবী থেকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে–

قال رسول الله ﷺ وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم

"জোহরের নামায ঠাণ্ডা অবস্থায় পড়ো, কেননা গরমের তীব্রতা দোযখের উত্তাপের কারণে হয়।" (সহীহ বোখারী ১/৭৮, হা. ৫৩৩, ৫৩৮ সহীহ মুসলিম ১/২২৪, হা. ৬১৫)

আনাস (রা.) থেকে আরো একটি হাদীস অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত–

كان رسول الله ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل

"রাসূলুল্লাহ (সা.) গরমকালে ঠাণ্ডা করে এবং শীতকালে তাড়াতাড়ি করে নামায পড়তেন।" (নাসাঈ ১/৮৭, হা. ৪৯৮, "হাদীস সহীহ")

বিশিষ্ট ফকীহ ইমাম ইবনে কুদামা লেখেন–

"ঠাণ্ডা করে নামায পড়ার অর্থ এতটুকু বিলম্ব করে জোহর নামায পড়া, যাতে গরম বিলুপ্ত হয়ে আবহাওয়া স্নিগ্ধ হয়ে যায়। আর প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে যে এত বিলম্ব করেন যে তাঁরা পাহাড়ের ছায়া দেখতে পান, এর দ্বারা নামায অতিবিলম্ব করেছেন বলে বোঝা যায়। (মুগনী, ১/৩৯০)। এ হাদীসসমূহের আলোকে জোহরের নামাযের ওয়াক্ত সূর্যের উত্তাপ বিলুপ্ত হওয়া তথা প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্তও অবশিষ্ট থাকবে বলে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়।

এ সমস্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী ইমাম বোখারী, ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ্, ইবনে কুদামাসহ অসংখ্য ইমাম মুহাদ্দীস, এমনকি তথাকথিত আহলে হাদীস মতবাদের ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং শাওকানীও গরমকালে জোহর নামায বিলম্ব করে পড়াকে মুস্তাহাব (উত্তম) বলে উল্লেখ করেছেন। (মুগনী, ১/৩৮৯ মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ, ২২/৯২-৯৩ নাইলুল আওতার ১/৩২৬)

লা-মাযহাবী মতবাদের প্রখ্যাত ইমাম শাওকানী লেখেন, "বিলম্বে নামায পড়ার হাদীসের দ্বারা তাড়াতাড়ি জোহর পড়ার সমস্ত হাদীস রহিত। এ মর্মে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, মুগিরা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন, আমরা প্রাথমিক অবস্থায় তাড়াতাড়ি জোহর আদায় করতাম, পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে বিলম্বে ঠাণ্ডায় জোহর আদায় করার নির্দেশ করেন।" (তাহাবী, ১/১৮৭, হা. ১০৩৭ নাইলুল আওতার ১/৩২৬)। এ ছাড়া বিলম্বে পড়া সমস্ত বিশুদ্ধ কিতাবে রয়েছে বিধায় জোহর নামায বিলম্বে পড়াই প্রাধান্যযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ।

জরুরি কয়েকটি মাসআলা

কাজী হোসাইন এবং ছয়দালানী এবং ইমামুল হারামাইন আসর নামাযের সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে আসরের জন্য কিছু সময় আছে, যার মধ্যে নামায পড়া উত্তম এবং কিছু সময় আছে, যার মধ্যে নামায পড়া বৈধ। আমরা নিম্নে তা আলোচনা করছি।

১। প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর আসরের নামায আদায় করা উত্তম ও ঐচ্ছিক সময়।

২। সূর্যের আলো হলুদ বর্ণ হওয়ার পর আসরের নামায পড়া জায়েয আছে। তবে এই সময়টা উত্তম নয়।

৩। সূর্যাস্তকালে আসরের নামায আদায় করা মাকরূহ। তবে কোনো কারণে এই সময়ে নামায আদায় করলেও মাকরূহসহ নামায আদায় হয়ে যাবে।

৪। অপারগতা ও অক্ষমতার সময় যেমন সফরের কারণে অথবা বৃষ্টির কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে, যদি ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পূর্বে আসর পড়ে নেয় তাহলে অক্ষমতার কারণে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। অথবা যদি কোনো মসজিদে ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পূর্বে আসরের জামা'আত আদায় করে এমতাবস্থায় জামা'আতে অংশ নেওয়াই ভালো। যথাসময়ে আসরের জামা'আত আদায়ের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে ফেতনা-ফ্যাসাদের আশঙ্কা হলে তা এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তাদের সাথে আসরের জামা'আত পড়ার সুযোগ আছে। (শরহুল মুহাযযাব ৩/২৮)

ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম যুফার (রহ.)-এর মতামতও এমনই বোঝা যায়। (উমদাতুল ক্বারী ৪/৪৯)

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৭

মুফতী শরীফুল আজম

তাশকীলের আদব :

হযরতজি (রহ.) বয়ান শেষে প্রত্যেক সাথিকে তার পাশের লোককে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া আর চিরস্থায়ী আখিরাতের কথা বুঝিয়ে তার দিল তৈরি করতে বলতেন,

جب بیان کرنے والا بات پوری کر چکے تو اب سب جماعت کے ساتھی اپنے قریب والوں کو سمجھاویں کہ دیکھو یہ دنیا عارضی ہے جو آگے کا عمل کیا ہوگا وہ باقی رہنے والی پونجی ہے

যে তৈরি হয়ে যায় ভালো, আর যারা এখনো তৈরি না হয় সেটাকে নিজের ত্রুটি মনে করবে যে হে আল্লাহ! আমি তাকে এর প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে পারিনি। যদি সে প্রয়োজন মনে করত তবে অবশ্যই বের হয়ে পড়ত।

হযরতজি (রহ.) বলেন,

بیان کے وقت جو تشکیل ہوگی اس پر اکتفاء نہ کرلو، بلکہ صبح جا کر اس کے گھر والوں کو سمجھاؤ۔

বয়ান শেষে যে তাশকীল হবে এটাকে যথেষ্ট মনে করা যাবে না, বরং সকালবেলা গিয়ে তার পরিবারের লোকদের বোঝানোর চেষ্টা করো। নাম লেখানোর পরও যদি কেহ পরে যেতে না পারে, তবে এটা মনে করবে না যে সে মিথ্যা ওয়াদা করেছিল। তাকে অপবাদ দেবে না। কারণ সে মসজিদের মাহোলের প্রভাবে বাস্তব ওয়াদাই করেছিল। এর পরে যখন অন্য পরিবেশে গেছে তখন আর পূর্বের দৃঢ়তা বহাল থাকেনি। তাই এখন তাকে সাহায্য করো, তাকে এবং তার পরিবারকে বোঝানোর চেষ্টা করো। নিজেদের চেষ্টার পর আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করো, হে আল্লাহ! আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। (সা. মা. এ.-৩/২০৫)

দিনে মেহনত রাতে দু'আ :

হযরতজি (রহ.) বলেন,

دن کی محنت ومساعی میں رات کی دعاؤں سے جان پڑتی ہے

"দিনের বেলার মেহনতে রাতের দু'আর কারণে প্রাণশক্তি ফিরে আসে।" (সা. মা. এ-৩/২০৮)

তাই মেহনতের কামিয়াবীর জন্য রাতে উঠে দু'আ-কান্নাকাটি করতে হবে।

আত্মতুষ্টি নেই :

তাশকীলের ফলে কারো দিল তৈরি হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হলে নিজে আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নেই। এ বিষয়ে বড় হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর হেদায়াত হচ্ছে,

یہ مت دیکھو کہ ایک شخص نے ہماری بات سمجھ لی اور اعتراف کرلیا، بلکہ اس پر غور کرو کہ ایسے کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ باقی ہیں جن کو ہم ابھی اللہ کی بات پہنچا بھی نہیں سکے اور کتنے ہیں جو واقفیت اور اعتراف کے بعد بھی ہماری کوششوں کی کمی کی وجہ سے عمل پر نہیں پڑے ہیں (ملفوظات ۱۳۵)

এটা দেখবে না যে এক ব্যক্তি আমাদের কথা মেনে নিয়েছে বরং চিন্তা করবে যে, এমন কত লক্ষ-কোটি মানুষ রয়ে গেছে যাদের কাছে এখনো পর্যন্ত আমরা আল্লাহর কথা পৌঁছাতে পারিনি। অনেকে এমন রয়েছে, যারা জেনে-বুঝেও আমাদের মেহনতের কমির কারণে আমলের ওপর ওঠেনি। (মালফুজাত-১৩৫)

হতাশা নেই :

অনেক চেষ্টার পরও কাউকে তাশকীল করতে না পারলে অথবা তাশকীলের পর উসূল করতে না পারলে হতাশ হতে নেই। আজকে যে নিম রাজি হয়েছে একসময় সে পুরো দুনিয়াতে এই মেহনত নিয়ে সফর করবে। আল্লাহর কাছে তার জন্য দু'আ করতে হবে আর নিজের দুর্বলতা পেশ করতে হবে।

এসংক্রান্ত হযরতজির (রহ.) ব্যক্তিগত অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। মেওয়াতে যখন প্রথম দাওয়াতের মেহনত শুরু হয়, মানুষ বিছানাপত্র সাথে নিয়ে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও জামা'আতে বের হওয়ার কথা বলে বড় হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যার যার বাড়িতে চলে যেত। হযরতজি (রহ.) এমন ঘটনা জানতে পেরেও হতাশ বা নিরাশ হতেন না। তিনি বলতেন,

کچھ حرج نہیں یونہی آہستہ آہستہ چلنے اور نکلنے کے رخ پر آجائیں گے (سوانح مولانا انعام الحسنؒ ۲/۲۴)

"কোনো অসুবিধা নেই। এভাবেই আস্তে আস্তে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে।" (সা. মা. এ-২/২৪)

দাওয়াত ও তাবলীগের তৃতীয় হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) বলেন, আমি ও মাওলানা ইউসুফ সাহেব একবার মেওয়াতে গেলাম। এই সফরে উভয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, যে গ্রামে নগদ জামা'আত উঠবে না, সেখানে আমরা খানা খাব না। সে মতে এক গ্রামে জামা'আত তৈরি না হওয়ায় খানা না খেয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। গ্রাম থেকে বের হতেই দেখি আমাদের পেছনে পেছনে ২০ জন লোক এসে

হাজির। তাদের সাথে গোনা ২০টি বিছানাপত্র ছিল। সঙ্গে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিল জামা'আত বন্দি হয়ে এসেছে। তারা বলল, এবার খাবার খেয়ে নিন। তাদের কথামতো আমরা খানা খেয়ে নিলাম, আমাদের খাওয়া শেষ হতেই ২০ জনের ২০ জনই নিজেদের বিছানাগুলো নিয়ে গ্রামের দিকে ফিরে গেল। আর আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। (সা. মা. এ-২/২৪)

নতুন তাশকীল :

দাওয়াত ও তাবলীগের আকাশে বর্তমানে যে কালো মেঘ জমাট বেঁধেছে তার সূচনা হয়েছে নতুন তাশকীল থেকে। ইতাআত, বাইআত, খেলাফত, ইমারত, জিহাদ, কিতাল ও বিপ্লবের তাশকীল চলছে খুব জোরেশোরে। তাবলীগের মাঝে এ সকল পরিভাষা ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। প্রায় এক শত বছর যাবত এই মেহনত বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত ঈমান-আমল বানানোর সংস্কারমূলক মেহনত হিসেবে। মুরব্বিগণ বলতেন তাহরীকে ঈমান ও তাজদীদে ঈমানের মেহনত। এমন সহজ-সরল পরিচয়ের ফলে মুসলিম-অমুসলিম সকল দেশে প্রসারিত হয় মুবারক এই মেহনত। অন্য কাজের ভিসা পেতে কষ্ট হলেও তাবলীগ জামা'আতের ভিসা মেলে খুব সহজেই। প্রথম তিন হযরতজির দূরদর্শিতা, সচেতনতা, দিকনির্দেশনা সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি আর সতর্ক শব্দ চয়ন সহায়ক হয় বিশ্ববাসীর আস্থা অর্জনে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে বর্তমানে ইতাআতের নামে যেভাবে তাবলীগ জামা'আতের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা চলছে তাতে আস্থার সংকটে পড়বে এই মেহনত। অচিরেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে বিশ্বের দেশে দেশে তাবলীগ জামা'আতের প্রবেশ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সরকার বাধ্য হয়ে এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে দিতে পারে।

বাইআতের প্রকার :

একটি বিষয় সকলের কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার যাতে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। চিল্লা, তিন চিল্লার তাশকীলের স্থলে বর্তমানে ইতাআতের তাশকীল করা হচ্ছে। এই বাইআতের মর্ম না বুঝেই সাথিরা সে দিকে ঝুঁকছে। বাইআত আরবী শব্দ, ب ى ع মূল ধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ কোনো বিষয়ে কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া বা অঙ্গীকার করা,

عاهده وعاقده كذا (المعجم الوسيط)

মৌলিকভাবে বাইআত দুই ভাগে বিভক্ত। এক. ইসলাহী বাইআত, যা নিজের ঈমান-আমল শোধরানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। দুই. ইতাআতের বাইআত, যা খলিফাতুল মুসলিমীনের আনুগত্য, জিহাদ, কিতালের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। উভয় প্রকার বাইআতের মাঝে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে।

(ক) ইসলাহী বাইআত পীর সাহেব তাঁর মুরিদদের কাছ থেকে নিয়ে থাকেন আর ইতাআতের বাইআত খলিফা তাঁর প্রজাদের কাছ থকে নিয়ে থাকেন।

(খ) ইসলাহী বাইআত মুস্তাহাব আর ইতাআতের বাইআত ওয়াজিব।

(গ) ইসলাহী বাইআত ঈমান-আমলের তরক্কীর জন্য সহায়ক মাত্র। না হলে তাকে বাগী বলা হয় না। আর ইতাআতের বাইআত না হয়ে খলিফার মোকাবেলা করলে তাকে বাগী বা রাষ্ট্রদ্রোহী বলা হয়।

(ঘ) ইসলাহী বাইআত অস্বীকারকারীর জন্য কোনো সাজার ব্যবস্থা নেই। আর ইতাআতের বাইআত অস্বীকার করে মোকাবেলা করলে খলিফা তাকে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন।

(ঙ) ইসলাহী বাইআতের জন্য পীর সাহেবের সাজারা তথা নবীজি (সা.) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাইআতের অনুমতিপত্র থাকতে হয়। পক্ষান্তরে ইতাআতের বাইআতের জন্য এমন কোনো সনদ বা সাজারা প্রয়োজন হয় না।

ইসলাহী বাইআত :

একজন মুসলমান আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও নবীজি (সা.)-এর তরীকার ওপর অটল-অবিচল থাকা ও মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার অঙ্গীকার নেওয়া এই বাইআতের উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে কিছু ইবাদত পালন ও কতেক গোনাহ বর্জনের ওয়াদা করানো হয়। ফলে মুরিদের মাঝে নেক আমলের আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং গোনাহ বর্জনের মানসিকতা তৈরি হয় আর গোনাহ হয়ে গেলে তাওবা করার তাওফিক হয়। এ ধরনের বাইআত নবীজি (সা.)-এর একটি সুন্নাত। এর দ্বারা জীবনের অনেক ফরয জিন্দা হয়। পক্ষান্তরে সুন্নাত ছেড়ে দিলে ফরযের মাঝে ধীরে ধীরে ত্রুটি চলে আসে।

নবীজি (সা.) যে সকল বিষয়ের ওপর সাহাবাদের কাছ থেকে বাইআত গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় তার সংখ্যা ত্রিশের উর্ধ্বে হবে। সিহাহ সিত্তাসহ হাদীসের কিতাবে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

পবিত্র কোরআনের আলোকে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

হে নবী! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এ কথার বাইআত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা আল মুমতাহিনা-১২)

উক্ত আয়াতে ছয়টি বিষয়ের ওপর বাইআত গ্রহণের আলোচনা এসেছে। যার সম্পর্ক ঈমান-আমল সংশোধন করে আত্মশুদ্ধি অর্জনের সাথে। এমন বাইআত আল্লাহর রাসূল (সা.) মহিলা-পুরুষ সকলের কাছ থেকেই নিতেন। যার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে।

পবিত্র হাদীসের আলোকে :

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ العَقَبَةِ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ

অর্থ : বদরী সাহাবী হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) সূত্রে বর্ণিত। যিনি আকাবার রজনীতে একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের এক জামা'আত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সকলকে আদেশ করলেন, তোমরা সকলেই আমার কাছে এ কথার ওপর বাইআত হও যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, দুই হাত ও দুই পায়ের মাঝখান থেকে সৃষ্ট পাপের অপবাদ অন্যের ওপর চাপাবে না, নেককাজে অবাধ্যতা করবে না। তোমাদের মধ্য হতে যারা এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে আল্লাহ তাদের উত্তম বদলা দান করবেন। আর যাদের দ্বারা কোনো গোনাহ হয়ে যাবে পৃথিবীতে তার কোনো শাস্তি হলে সে গোনাহ মাফ হয়ে যাবে, আর যার গোনাহ আল্লাহ গোপন রাখবেন তার বিষয় আল্লাহর ওপর ন্যস্ত, তিনি চাইলে মাফ করে দেবেন অথবা পরকালে শাস্তি দেবেন। আমরা এ সকল শর্তে নবীজি (সা.)-এর কাছে বাইআত হলাম। (বোখারী শরীফ-১/৭, হা.১৮)

উক্ত হাদীসের মাঝে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বাইআতের বিষয় হুবহু উল্লেখ হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে ইসলামের প্রচার প্রকাশ্যে হতে নানা প্রকারের বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল। হজের মৌসুমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ মক্কা শরীফে উপস্থিত হতো। নবীজি (সা.) এই সুযোগে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন অতি গোপনে।

বাইআতে আকাবা :

হিজরতপূর্ব নবুওয়াতের দ্বাদশ বছর হজ মৌসুমে নবীজি (সা.) হাজীদের মাঝে দাওয়াতের মেহনতের উদ্দেশ্যে মিনার ময়দানে উপস্থিত। বিগত বছর হজ মৌসুমে মদীনা শরীফের ছয়জন হাজী নবীজির (সা.) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ বছর তাঁরা মদীনার ১২টি গোত্রের ১২ জন প্রতিনিধি নিয়ে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিনায় উপস্থিত হয়েছেন। আকাবা নামক মিনার একটি পাহাড়ি গুহায় হযরত উবাদা (রা.)-এর নেতৃত্বে ১২ জনের কাফেলা নবীজির (সা.) হাতে ইসলাহের বাইআত গ্রহণ করেন। এটা আকাবার প্রথম বাইআত হিসেবে প্রসিদ্ধ। পরের বছর ৭৩ জনের বিশাল কাফেলা আকাবায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে নবীজি (সা.)-এর হাতে ইসলাম ও ইসলাহের বাইআত চলতে থাকে। তখনো জিহাদের বিধান চালু হয়নি। তাই বিভিন্ন স্থানে শুধু ইসলাহী বাইআত নেওয়া হতো।

জিহাদপূর্ব বাইআত :

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে,

عن عبادة بن الصامتؓ قال: كنا احد عشر رجلا في العقبة الاولى فبايعنا رسول الله ﷺ بيعة النساء قبل ان يفرض علينا الحرب بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نأتى ببهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا نقتل اولادنا ولا نعصيه فى معروف فمن وفى فله الجنة ومن غشى شيئا فامره الى الله ان شاء عذبه وانشاء غفرله ثم انصرفوا العام المقبل عن بيعتهم (كنز العمال ١/١٧١)

অর্থ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বলেন, আকাবার প্রথম বাইআতের সময় আমরা ১১ জন লোক ছিলাম, জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে মহিলাদের বাইআতের ন্যায় বাইআত হয়েছিলাম। আমরা তাঁর

কাছে এ কথার ওপর বাইআত হয়েছিলাম যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না, চুরি করব না, যিনা করব না, কারো চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করব না, নিজ সন্তানদের হত্যা করব না, সৎ কাজে তার অবাধ্যতা করব না। যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূরা করবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত, আর যে কোনো রূপ প্রতারণা করবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত হবে। তিনি চাইলে শাস্তি দেবেন অথবা মাফ করে দেবেন। (কানজুল উম্মাল-১/১৭১)

মহিলাদের বাইআত :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ، فَقَالَ :(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) (الممتحنة :١٢) الآيَةَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا :آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا :نَعَمْ، -لاَ يَدْرِى حَسَنٌ مَنْ هِيَ -قَالَ :فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ :هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِى وَأُمِّى فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِى ثَوْبِ بِلاَلٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ " :الْفَتَخُ :الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ

ইবনে জুরাইজ (রা.) বলেছেন, হাসান ইবনে মুসলিম (রা.) তাউস (রা.)-এর মাধ্যমে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী কারীম (সা.) আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর সঙ্গে ঈদুল ফিতরে আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা খুতবার আগে সালাত আদায় করতেন, পরে খুতবা দিতেন। নবী কারীম (সা.) বের হলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তিনি হাতের ইশারায় (লোকদের) বসিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তাদের কাতার ফাঁক করে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের কাছে এলেন। বিলাল (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তখন নবী কারীম (সা.) কোরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

অর্থ : হে নবী! যখন ঈমানদার মহিলাগণ আপনার নিকট এ শর্তে বাইআত করতে আসেন.... (সূরা মুমতাহিনা-১২) (বোখারী শরীফ বাংলা-২/২১৯)

উল্লেখ্য যে মহিলাদের বাইআতে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। পুরুষদের মতো মহিলাদের হাত ধরে বাইআত করানো হতো না। তাদের বাইআত শুধু মৌখিক অঙ্গীকারের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকত। হাত না ধরে শপথবাক্য পাঠ করানো হতো। এসংক্রান্ত এক হাদীসে এসেছে,

أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ :كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ) (الممتحنة١٢ :) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ :فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ :وَاللهِ، مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ :قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا

অর্থ : আবু তাহির আহমদ ইবনে আমর সারাহ (রহ.) নবী কারীম (সা.)-এর স্ত্রী সহধর্মিণী আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুমিন মহিলাগণ যখন হিজরত করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে (মদিনায়) আসতেন, তখন আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী 'পরীক্ষা' করা হতো। (সে বাণী হচ্ছে) হে নবী! যখন মুমিন মহিলাগণ আপনার কাছে এ মর্মে বাইআত হতে আসে যে তারা আল্লাহর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না। (সূরা মুমতাহিনা)। আয়াতের শেষ পর্যন্ত আয়েশা (রা.) বলেন, মুমিন মহিলাদের যে কেউ এসব অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতো এতেই তারা বাইআতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে যখন তারা মৌখিকভাবে এসব অঙ্গীকার করত তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের বলতেন, তোমরা চলে যাও, তোমাদেরকে বাইআত করে নিয়েছি। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র হাত কোনো দিন কোনো (বেগানা) মহিলার হাতকে স্পর্শ করেনি।

তবে মৌখিকভাবে বাইআত গ্রহণ করতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা

ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো দিন মহিলাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেননি এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাত কোনো দিন কোনো (বেগানা) মহিলার হাত স্পর্শ করেনি। তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের পরই তিনি বলে দিতেন, তোমাদের মৌখিকভাবে বাইআত গ্রহণ করলাম। (মুসলিম শরীফ, হা. [১৮৬৬] ৮৮)

হযরতজি ইলিয়াছ (রহ.)-এর বাইআত : ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ ২৮ এপ্রিল মাযাহেরে উলূম সাহারানপুর মাদরাসা থেকে বিশ্ব বিস্তৃত এই তাবলীগের মেহনতের সূচনা হয়। হযরতজি ইলিয়াছ (রহ.) সেদিন সাহারানপুর মাদরাসার সকল শিক্ষককে একত্রিত করে তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে তুলে ধরেন। দীর্ঘ আলোচনার পর মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের সমন্বয়ে জামা'আত তাশকীল হয় এবং সর্বপ্রথম পার্শ্ববর্তী মহল্লা নয়াবাস نیابانس এলাকায় জামা'আত পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত পরামর্শ থেকে দাওয়াতের মেহনত কিভাবে পরিচালিত হবে তার সংক্ষিপ্ত কিছু উসূল ঠিক করা হয়, মানুষদেরকে প্রথমে মসজিদে এনে নামায পড়ানো হবে। অতঃপর ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্সাল শিক্ষা দেওয়া হবে এবং এর অর্থের স্বীকারোক্তি নেওয়া হবে। এরপর পীর-মাশায়েখগণ যে সকল বিষয় থেকে তাওবা করিয়ে থাকেন সেগুলো থেকে তাওবা করানো হবে। কোনো গোনাহ বেশি প্রচলিত হলে তা থেকে গুরুত্ব দিয়ে তাওবা করাতে হবে।

اس کے بعد مشائخ سلوک جن اشیاء سے توبہ کراتے ہیں ان سے توبہ کرائے کوئی منکر اگر شائع ہو تو اس سے خاص طور سے توبہ کرائی جائے (سوانح ۱/۳۵)

প্রথম দিন থেকে এটি ছিল হযরতজি (রহ.)-এর কর্মপন্থা। তিনি পীর-মাশায়েখদের মতো তাওবা পড়িয়ে মানুষদেরকে তাবলীগের কাজে লাগাতেন। পীর-মাশায়েখদের মাঝে যে তাওবা প্রচলিত আছে তা হচ্ছে কোরআন-সুন্নায় বর্ণিত ইসলাহী বাইআতের অংশ। তাঁদের বাইআতে ওই সকল শপথবাক্য উচ্চারণ করানো হয়, যার বর্ণনা কোরআন-হাদীসের আলোকে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) এভাবেই ইসলাহী বাইআতের মাধ্যমে তাবলীগের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি কখনো এতাআতের বাইআত করাতেন না।

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) নিজেই একজন উচ্চস্তরের পীর ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি গাংগুহী (রহ.)-এর কাছে বাইআত হয়েছিলেন। অতঃপর খলিল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) তাঁকে বাইআতের অনুমতি প্রদান করেন। যার ভিত্তিতে তিনি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ও মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-কে বাইআত করান এবং ইজাযত প্রদান করেন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে একসাথে তাঁরা দুজন হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর হাতে বাইআত হলে তিনি উভয়কে পাছে আনফাছের অজিফা প্রদান করেন। এর সাথে মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-কে এসমে যাত তথা আল্লাহ, আল্লাহ যিকির তিন হাজার বার এবং মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-কে বারো হাজার বার করার জন্য বলেন। (সা. মা. এ-১/২২২)

এটা ছিল ইসলাহী বাইআত, যিকির শোগলের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির বাইআত। ইতাআতের বাইআত নয়। তাবলীগের মুরব্বিগণ কখনো ইতাআতের বাইআত নিতেন না।

অবুঝ সাথিরা এখন বলে বেড়ায় এত হাজার বার আল্লাহ আল্লাহ যিকির কোরআন-হাদীসে নেই। এ সকল পীর-মাশায়েখের তসবীহ জপার চেয়ে মসনুন যিকির করা ভালো। কিছুদিন পর যদি তারা বলে তাবলীগের ছয় ছিফাত আর পাঁচ কাজের কথা কোরআন-হাদীসে নেই তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ পূর্বের তিন হযরতজির যিকির শোগলের মেহনত, ইসলাহী বাইআতের মেহনত যদি অস্বীকার করা যায় তবে অন্য সব তাবলীগি উসূল অস্বীকার করতে অসুবিধা কোথায়।

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর বাইআত :

দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) একই তরীকায় বাইআত করাতেন। ১৩ জুলাই ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ ফজরের আযানের সময় হযরতজি ইলিয়াছ (রহ.) ইন্তেকাল করেন। এর এক দিন পূর্বে পরামর্শক্রমে মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-কে তাঁর জানেশিন ও পরবর্তী হযরতজি হিসেবে ফয়সালা করা হয়। সেদিন থেকেই তিনি হযরতজি ইলিয়াছ (রহ.)-এর নির্দেশে বাইআত করানো আরম্ভ করে দেন। পরের দিন মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) ইন্তেকাল করলে তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন মাওলানা ইউসুফ (রহ.)। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) মরহুম হযরতজির পাগড়ি মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর মাথায় বেঁধে দেন এবং পাশে বসে লোকদেরকে তাঁর হাতে বাইআত করান। হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.) হযরত মাওলানা জাফর আহমদ থানভী (রহ.) জনাব হাফেজ ফখরুদ্দীন (রহ.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। (সা. মা. এ-১/৯০)

এটা ছিল ইসলাহী বাইআত, ইতাআতের

বাইআত নয়। যাতে পীর-মাশায়েখের তরীকা মতো বাইআত নেওয়া হতো এবং তাবলীগের মেহনত মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হতো।

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) সাথিদের কাছ থেকে কিভাবে ইসলাহী বাইআত নিতেন তার বিবরণ সাওয়ানেহে মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) নামক পুস্তিকায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

آپ کا طریقہ بیعت یہ تھا کہ سب سے پہلے بیعت کے فضائل بیان فرماتے اس کے بعد عام طریقہ بیعت (جو ان کے مشائخ کے یہاں مروج تھا) سے کام لیتے پھر دینی دعوت کے فضائل سنا کر اس کے لیے مرمٹنے اور اوقات دینے کا عہد کراتے (سوانح ۱/۱۰۰)

তাঁর বাইআত নেওয়ার পদ্ধতি ছিল, সর্বপ্রথম বাইআতের হাকীকত, স্বরূপ, গুরুত্ব, আদব, জিম্মাদারি ও ফাযায়েল বর্ণনা করতেন। এরপর বাইআতের সাধারণ নিয়ম (যা তাঁর পীর-মাশায়েখের মাঝে প্রচলিত ছিল) অনুযায়ী বাইআত করাতেন। অতঃপর দ্বীনি দাওয়াতের ফজীলত শুনিয়ে এর জন্য জানপ্রাণ দিয়ে মেহনত করা ও সময় লাগানোর অঙ্গীকার নিতেন। (সা. মা. এ-১/১০০)। এভাবে তিনি ইসলাহী বাইআত নিতেন, ইতাআতের নয়।

হযরতজি মাওলান এনামুল হাসান (রহ.)-এর বাইআত :

১৯৬৫ খ্রি, ১২ এপ্রিল জুমু'আ বার হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) তাবলীগি এক সফরে থাকাবস্থায় পাকিস্তানে আকস্মিক ইন্তেকাল করেন। পরের দিন নিজামুদ্দিনে জানাযা শেষে দাফন করা হয়। শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)সহ উপস্থিত উলামায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-কে তাঁর স্থলাভিসিক্ত করা হয়। ওই মজলিসেই তিনি উপস্থিত সাথিদের বাইআতে ইসলাহ আরম্ভ করেন। এরপর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ইজতেমা জোড় ইত্যাদির মাঝে তিনি বাইআতের এ ধারা চালু রাখেন। আমাদের দেশে তিনি টঙ্গী ইজতেমার ময়দানে বিদেশি নিবাসে এবং কাকরাইল মসজিদে বাইআত করাতেন। কাকরাইলের বর্তমান শুরাদের অনেকে তাঁর হাতে বাইআত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনিও পীর-মাশায়েখের তরীকা অনুযায়ী ইসলাহী বাইআত নিতেন ইতাআতের বাইআত নয়।

তাঁর বাইআতের পদ্ধতি হতো এমন, প্রথমে মসনুন খুতবা পাঠ করতেন এবং এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অতঃপর বলতেন আমি যা বলছি, তা ধ্যানের সাথে শুনতে থাকুন এবং মুখে বলতে থাকুন,

لا اله الا الله محمد رسول الله کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں اللہ پاک کے سوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پاک بندے ہیں، ایمان لائے ہم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اسکے رسولوں پر قیامت کے دن پر تقدیر پر جو کچھ بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ایمان لائے ہم اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی اعلی ذات میں ہے اور پاک صفات میں ہے اور قبول کئے ہم نے اس کے سارے حکم توبہ کی ہم نے شرک سے کفر سے بدعت سے پرایا مال ناحق کھانے سے ناحق خون سے چوری سے زنا سے شراب سے جوے سے سود سے جھوٹ سے غیبت سے بہتان سے دین پھیلانے میں کمی کرنے سے دین سیکھنے میں کمی کرنے سے سستی کرنے سے اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے عہد کرتے ہیں شرک کفر نہیں کریں گے بدعت نہیں کریں گے اور انشاء اللہ تمام گناہوں سے بچیں گے، اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما عہد میں ہمیں مضبوط فرما، بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے۔ (سوانح حضرت جی ثالث مولانا محمد انعام الحسن کاندھلویؒ ۳/۳۴۰)

অর্থ : আল্লাহ পাক ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেহ নেই, দিল লাগানোর যোগ্য কেহ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর সত্য ও পবিত্র বান্দা। আমরা ঈমান আনিলাম আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেস্তাদের ওপর, তাঁর আসমানী কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলগণের ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, তাকদীরের ওপর যে ভাগ্যের ভালো-মন্দ সব আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর।

আমরা ঈমান আনিলাম আল্লাহর ওপর, যেমন তিনি নিজ সত্তার মাঝে ও পবিত্র গুণাবলির মাঝে বিরাজমান এবং আমরা তাঁর সকল হুকুম-আহকাম কবুল করে নিলাম। আমরা তাওবা করছি শিরক, কুফর, বিদ'আত থেকে। অন্যের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করা থেকে, খুন, চুরি, ব্যভিচার, শরাব, জুয়া, সুদ, মিথ্যা, গীবত, অপবাদ থেকে। দ্বীনের প্রচারে ত্রুটি করা ও দ্বীন শিখতে অলসতা থেকে

এবং সকল প্রকার ছোট-বড় গোনাহ থেকে তাওবা করছি। আমরা অঙ্গীকার করছি শিরক-কুফর করব না। বিদ'আত করব না। ইনশাআল্লাহ সকল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকব। হে আল্লাহ! আমাদের তাওবা কবুল করুন। শপথের মাঝে দৃঢ়তা দান করুন। আমরা এনামের মধ্যস্থতায় হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ (রহ.)-এর হাতে বাইআত হলাম। (সা. মা. এ-৩/৩৪০)

তিনি বাইআতের মাঝে যে শপথবাক্যগুলো উচ্চারণ করাতেন তা কোরআন-হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের সাথে হুবহু মিলে যায়। এটাই পীর-মাশায়েখের বাইআত। ইসলাহী বাইআত। তাবলীগের সকল মুরব্বির মাঝে প্রচলিত বাইআত। তাঁরা ইসলাহী বাইআত নিতেন, ইতআতের বাইআত নিতেন না। তাঁদের হাতে কেহ বাইআত না হলে তাকে জাহান্নামী বলা হতো না। বাগী আখ্যা দেওয়া হতো না। ওয়াজিবুল কতল ঘোষণা করা হতো না। কেননা তাঁদের এই বাইআত ছিল ইসলাহী বাইআত। যেটা মুস্তাহাব বা সুন্নাত পর্যায়ের একটি মুবারক আমল। এর জন্য কাউকে জাহান্নামী অথবা বাগী বলা যায় না।

ইসলাহী বাইআত বন্ধ হলো :

১৯৯৫ খ্রি. ৯ জুন হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি ১০ সদস্যের শুরা বানিয়ে যান। কিন্তু এই শুরাদের পক্ষ থেকে কাউকে চতুর্থ হযরতজি হিসেবে বানানো হয়নি। তখনকার পরিস্থিতি কী ছিল তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কী কারণে আমির নির্ধারণ করা হলো না, শুরার মাধ্যমে কাজ আরম্ভ হলো, এ ব্যাপারে দুই রকম বক্তব্য পাওয়া যায়। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে ওই সময় থেকে ইসলাহী বাইআতের মুবারক ধারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুরাদের মতামতের ভিত্তিতে ফয়সালা হয় যে এখন থেকে নিজামুদ্দিনে আর বাইআত নেওয়া হবে না। বস্তুত সেদিন থেকেই দাওয়াতের এই মুবারক মেহনতের মাঝে চক্রান্তের বীজ বপন হয়ে যায়। পূর্বের তিন হযরতজি যে বাইআতকে এত গুরুত্ব দিয়ে আসছিলেন আজ তা অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ হয়ে গেল ফলে কাজের বরকত উঠে গেল।

শুরা সদস্যদের মধ্যে মাওলানা সা'দ সাহেবের বাইআত করানোর ইজাযত বা খেলাফত ছিল না, কিন্তু মাওলানা যুবাইরুল হাসান সাহেব হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) ও শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) থেকে বাইআতের ইজাযতপ্রাপ্ত ছিলেন। সকলে একমত হয়ে তাঁর মাধ্যমে বাইআতের মুবারক ধারা বাকি রেখে তিন হযরতজির নাহজ বা কর্মপন্থা ধরে রাখতে পারতেন। কিন্তু কী কারণে এটা হলো না, তা বোধগম্য নয়। তাবলীগের মাঝে পরিবারতন্ত্র মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-কে আমির বানানোর মাধ্যমে পূর্বেই বন্ধ করা হয়েছিল। আরেকবার মাওলানা যুবাইরুল হাসান (রহ.)-এর হাতে বাইআতের ধারা চালু হলে সকল ফেতনার দরজা বন্ধ হয়ে যেত।

তাবলীগের মজমায় সর্বশেষ ইসলাহী বাইআত নেওয়া হয় মুযাফ্ফরনগর ইজতিমায়। হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে ৬ জুন ১৯৯৫ খ্রি. অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমা শেষে যথারীতি তিনি বাইআত করান। তাঁর ইন্তেকালের পর বাইআতের এই ধারাকে শুধু বন্ধই করা হয়নি বরং এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়েছে। প্রথমে প্রচার করা হয় তাবলীগ করলে ইসলাহ হয়ে যায় বাইআত লাগে না। এরপর ধীরে ধীরে ইসলাহী বাইআত বা পীর-মুরীদিকে একটি অনৈসলামিক কাজ হিসেবে সাথিদের কাছে তুলে ধরা হয়। ফলে তাবলীগের সাথিরা বাইআত ও পীর-মুরীদিকে ঘৃণার চোখে দেখা আরম্ভ করে। উলামা-মাশায়েখের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে শেখে। এভাবে কেটে যায় ১৯টি বছর। এর মাঝে তাবলীগের কাজ প্রথম তিন হযরতজির কর্মপন্থা থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা যুবাইরুল হাসান (রহ.) ইন্তেকাল করলে নিজামুদ্দিনে বাইআতের ধারা হঠাৎ চালু হয়। কিন্তু এবার আর আগের মতো ইসলাহী বাইআত নয়, শুরু হয় ইতাআতের বাইআত। তাবলীগের সাথিদের কাছে একেবারে অপরিচিত এই পরিভাষা। এত দিন যেখানে বাইআতের বদনাম করা হতো আজ ভোল পাল্টে কারো সাথে পরামর্শ ছাড়া একক সিদ্ধান্তে ইতাআতের বাইআত আরম্ভ হলো। তাও আবার হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-এর দিকে নিসবত করে, অথচ তিনি এমন বাইআতের ইজাযত বা খেলাফত প্রদান করেননি। মাওলানা সা'দ সাহেব (দা.বা.) হযরতজি মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.)-কে দেখেননি, মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর জমানাও পাননি। যে বছর মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ইন্তেকাল করেন ওই বছর মাওলানা সা'দ সাহেব (দা.বা.) জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইলিয়াছ (রহ.)-এর নাম ধরে তাঁর বাইআত করানো ধোঁকার শামিল।

(বাইআতের দ্বিতীয় প্রকার ইতা'আতের বাইআত সম্পর্কে বিস্তারিত আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

ভিন্ন চোখে কওমি মাদরাসা-১৮

মাওলানা কাসেম শরীফ

আব্বাসী যুগে শিক্ষাব্যবস্থা :

আব্বাসী যুগের শিক্ষাব্যবস্থা উমাইয়া যুগের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে রচিত। আব্বাসী খলিফারা রাজ্যশাসন ও রাজ্যজয় অপেক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে ইতিহাসে অধিক খ্যাতি ও প্রসদ্ধি অর্জন করেছেন। এ যুগ ইসলামের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত।

আব্বাসী যুগেও বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না; যদিও সে সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং অনেক মক্তব-মাদরাসাও গড়ে উঠেছিল। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুটি রূপ ছিল–

১. প্রাথমিক ও ২. উচ্চপর্যায়ের।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্বাভাবিকভাবে জন্মেছিল মসজিদ ও গৃহাঙ্গনে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াকুত বলেন যে তিনি একজন শেখের গৃহকে বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। ফলে উমাইয়া যুগের মতো বেশির ভাগ শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাঙ্গন ছিল গৃহাঙ্গন ও মসজিদ। গৃহে সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে পিতার ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান শিক্ষার হাতেখড়ি নিত সর্বপ্রথম কালিমা তাইয়েবা পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে।

আব্বাসী যুগে নারীদের শিক্ষার্জনের প্রসার ও ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। সাধারণ পরিবারের মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ দেখা যায়। অভিজাত ঘরের মেয়েরা Private tutor রেখে ধর্ম ও শালীনতামণ্ডিত সাহিত্য, ছন্দ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। উচ্চশিক্ষার আগার ছিল বায়তুল হিকমাহ। খলিফা আল মামুন ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানে সৌরবিজ্ঞান, অনুবাদ, বিশেষ করে প্রাচীন গ্রিক, সিরীয় ও পারসি সাহিত্যের অনুবাদ, সাহিত্য শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হতো।

ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত অর্থে প্রথম উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচেছ দরসে নিজামী। সেলজুক সুলতান আলপ আরসালান ও মালিক শাহের আমলে তাদের পারসি মন্ত্রী নিজামুলমুলক এ প্রতিষ্ঠানটির স্থাপিয়তা। ১০৬৫-৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করা হয়। আল-কোরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসূলে শরীয়ত, প্রাচীন কবিতা ইত্যাদি বিষয় এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হতো। আবাসিক ব্যবস্থা ও বৃত্তিসহ ছাত্রদের লেখাপড়ার সুযোগ এখানে ছিল। প্রখ্যাত ইসলামিক দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রহ.) এ প্রতিষ্ঠানে (১০১১-১৫) সুদীর্ঘ চার বছর অধ্যাপনা করেছেন। নিজামিয়া মাদরাসা তদানীন্তন খলিফা কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা খলিফার অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োজিত হতেন।

আব্বাসী যুগ কলঙ্কের যুগও!

শিক্ষার ক্ষেত্রে আব্বাসীয় যুগ একদিকে যেমন স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে, অন্যদিকে এ যুগই মুসলিম তথা ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিকৃতির এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ও। এ অধ্যায়ের সূচনাকারী হচ্ছে খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট মুতাজিলা সম্প্রদায়। মুতাজিলা শব্দের অর্থ হচ্ছে পথচ্যুত। এ সম্প্রদায়ের মতবাদ প্রবর্তক ইরাক নিবাসী ওয়াসিল ইবনে আতা (৬৯৯-৭৪৯)। সে তার উস্তাদ হাসান বসরী (রা.)-এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতনৈক্য করে। 'কবীরা গোনাহকারী মুসলিম নন'–এমন চিন্তা লালন করে সে তার শিক্ষক হাসান বসরী (রহ.)-এর মজলিস থেকে উঠে চলে যায়। এ মতপার্থক্য হওয়ায় হাসান বসরী (রহ.) ওয়াসেল সম্পর্কে বলেন, 'ইতাজালা মিন্না, অর্থাৎ সে আমার পথ হতে সরে গেছে।' মুতাজিলি মতবাদের প্রবর্তক এই ওয়াসিল ইবনে আতা খলিফা মামুন কর্তৃক গ্রিক, পারসি ও সিরীয় গ্রন্থের অনুবাদকৃত সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়। সে ইসলাম, বিশেষ করে আল-কোরআনকে অ্যারিস্টটলের দর্শনের সঙ্গে একাকার করে দেখানোর অপপ্রয়াস চালায়। তারা আল-কোরআনকে created বা সৃষ্ট গ্রন্থ হিসেবে যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করার অপপ্রয়াস চালিয়ে এর ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য সন্দেহযুক্ত করে তোলে। ফলে তদানীন্তনকালের প্রখ্যাত পণ্ডিত আবদুল হুজাইন, আমর ইবনে উবাইদ, মুহাম্মদ আল জাবকীর প্রমুখ, এমনকি খলিফা মামুন পর্যন্ত সবাই আল-কোরআনকে নিছক যুক্তি ও বিবেচনার ভিত্তিতে মানবসৃষ্ট দর্শন ও সাহিত্যের কাতারে বিচার-বিশ্লেষণের হীনতম পর্যায়ে নেমে আসেন।

ইউরোপীয় গির্জা যুগের (মধ্যযুগ) যাজক সম্প্রদায় তাদের মতবাদের প্রতিবাদকারীদের যেরূপ নির্যাতন করেছিল, আববাসী আমলে অনুরূপ

নির্যাতনের শিকার হয়েছিল বহু আল্লাহভীরু আলেম মুতাজিলি মতবাদের প্রতিবাদের কারণে।

গ্রিক তথা হেলেনীয় (Hellenistic) প্রভাবমণ্ডিত মুতাজিলা সম্প্রদায় ইসলামের ওপর নিছক যুক্তি-চিন্তার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে মুসলিম মিল্লাতকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও দর্শনের মায়াজালে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। এটাই হচ্ছে আববাসী যুগের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সর্বশেষ কলঙ্ক তিলক।

মুসলিম শাসনামলে স্পেনের শিক্ষাব্যবস্থা

আববাসীদের খিলাফত লাভের পর উমাইয়া বংশের আবদুর রহমান আরব উপমহাদেশ হতে পালিয়ে কালক্রমে স্পেনে খিলাফত কায়েম করেন। তাঁর বংশধররাই ইতিহাসে মুরিস স্পেন নামে খ্যাত। উমাইয়াদের খিলাফত স্পেনে কায়েম হওয়ার ফলে কালক্রমে গোটা ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে পড়ে। মুরদের আমলে স্পেন গোটা ইউরোপ ও আফ্রিকার seat of learning বা শিক্ষার বেদিমূল হিসেবে গৌরবময় মর্যাদা লাভ করেছিল ।

কর্ডোভা, সেভিল, জেইন ও মালাগারের কলেজগুলোতে উচ্চশিক্ষা লাভ করার জন্য ইতালি, ফ্রান্স, ও ইংল্যান্ড হতে শিক্ষার্থীরা ভিড় জমাত। শুধু কর্ডোভাতেই ৭০টি পাবলিক লাইব্রেরি, ৭০টি কলেজ ও প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ২০০টি স্কুল ছিল।

খলিফা হাকাম আল-মুনতাসীর নিম্ন পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শুধু রাজধানীতেই ২৭টি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিঃস্ব অভিভাবকদের তিনি শিক্ষাব্যয়ের জন্য দান করতেন অকাতরে। রাষ্ট্রের তরফ হতে বিনা পয়সায় বই-পত্র দেওয়ারও তিনি ব্যবস্থা করেন। তাঁর আমেলই কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অনেকের মতে, এটা কায়রোর 'আল-আজহার' এবং বাগদাদের 'নিজামিয়া মাদরাসা'র চেয়েও উন্নত ছিল।

ঐতিহাসিক ডজি তখনকার মুরীয় স্পেন ও ইউরোপের চিত্র তুলে ধরেন এভাবে : In Spain almost everybodz knew how to read and write, whilst in Christian Europe, save and except the clergy, even parsons belonging to highest ranks were wholely ignorant. (History of the Saracens -A. Ali.)।

স্পেনে প্রায় সবাই পড়া ও লেখা জানত, তখন খ্রিস্টান ইউরোপে পুরোহিত সম্প্রদায় ছাড়া সবাই ছিল নিরেট মূর্খ। এমনকি উচ্চ পদের ব্যক্তিরাও! অন্য কথায় মুরদের আগমন, রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিকাশ তখনকার দিনে স্পেনে না ঘটলে আজও বোধ হয় স্পেন শিক্ষা ও সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত থাকত। এর পরিণতিতে গোটা ইউরোপও নিকষ কালো আঁধারে নিমজ্জিত থাকত।

ফাতিমী যুগে শিক্ষাব্যবস্থা

হযরত উমর (রা)-এর সময় মিসর মুসলমানদের অধীনে আসে। সেই থেকে মুসলিম শাসন ও শিক্ষার প্রভাবে দেশটি বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে। কালক্রমে ফাতিমী আমলে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। পরিব্রাজক বেনজামিন তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে (Itinerary) লেখেন যে তিনি ফাতিমী আমলে ২০টিরও অধিক দর্শন চর্চার প্রতিষ্ঠান দেখতে পান। কায়রোতে সে আমলে অসংখ্য কলেজ ছিল। রাজকীয় বা ImperialLibrary -তে এক লাখের মতো বাঁধাই করা বই ছিল। অধ্যয়ন করার জন্য বিনা চার্জে এসব গ্রন্থ ধার দেওয়া হতো। ফাতিমীরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের মতোই বিদ্যোৎসাহী ও জ্ঞানানুশীলনে মশগুল ছিলেন। তাঁদের আমলে দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল।

মুসলমানদের হাতেই বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটির উদ্ভব হয়েছে লাতিন Universitas Magistrorum et Scholarium থেকে। যার অর্থ শিক্ষক ও পণ্ডিতদের সম্প্রদায়। বিদ্যালয় শব্দটির সঙ্গে বিশ্ব শব্দটি যোগ করার অর্থ হলো, এই বিদ্যাপীঠ কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির জন্য নয়। এটি সারা বিশ্বের জন্য। এখানে সারা বিশ্বের যেকোনো দেশের মানুষ পড়তে ও পড়াতে পারবে। বর্তমানে পৃথিবীতে লাখো ইউনিভার্সিটি আছে। কিন্তু কোনটি পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, তা নিয়ে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়।

চীনাদের দাবি হচ্ছে, পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হলো চীনের সাংহাই হায়ার স্কুল। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ২২৫৭ সালে। অল্পকাল পরেই এটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আরো একটি বিশ্ববিদ্যালয় চীনের ঝু ডায়নাস্টির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম ইম্পেরিয়াল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (Imperial Central School)। খ্রিস্টপূর্ব ১০৪৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি টিকে ছিল ২৪৯ বছর পর্যন্ত।

পাকিস্তানিদের দাবি হলো, পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হলো পাকিস্তানের তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। আজ থেকে দুই হাজার ৭০০ বছর আগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাবিলন, গ্রিস, সিরিয়া, পারস্য, আরব, চীনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা এখানে ভিড় করত।

প্রতিকূল যোগাযোগব্যবস্থা, অমসৃণ পথের দুঃসহ যন্ত্রণা আর পথে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে উচ্চশিক্ষার হিরণ্ময় সাফল্য লাভের আশায় জ্ঞানপিপাসুদের মেলা বসত এখানে। সারা বিশ্ব থেকে ১০ হাজার ৫০০ জন ছাত্র উচ্চতর গবেষণার জন্য আসতেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমান পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি জেলায় ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। পাকিস্তানের বর্তমান রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। তার ধ্বংসাবশেষ এখনো সেখানে রক্ষিত আছে।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা অবশ্য এটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাপকাঠিতে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তাঁদের দাবি হলো, তক্ষশীলা শিক্ষালয়টি বর্তমানের বিভিন্ন ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে সাধারণত আমাদের চোখে ভেসে ওঠে কোনো একটি একক উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যেটি পরিচালিত হয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়ে। কিন্তু

তক্ষশীলার ক্ষেত্রে তা যায় না। এখানে শিক্ষকরা ছিলেন স্বাধীন। যে যাঁর মতো পাঠদান করতেন। তাঁরা খণ্ড খণ্ড

বিভাগের দায়িত্ব থেকে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিচালনা করতেন। তক্ষশীলাকে বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করা যায় কি না, তা নিয়ে বিজ্ঞ মহলে যুক্তি-পাল্টাযুক্তির তীর নিক্ষেপ চললেও তক্ষশীলা যে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল, সে বিষয়ে সবাই একমত।

এদিকে ভারতীয়দের দাবি হলো, বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ভারতের বিহারের রাজগিরের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সময়ের ব্যবধানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ও একসময় বন্ধ হয়ে যায়। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়টি সর্বপ্রথম ৪৫৫ থেকে ৪৬৭ সাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে। পরে দ্বিতীয় দফায় ৬০০ সালে বন্ধ হয়ে ৬৬৮ সালে পুনরায় চালু হয়। কিন্তু ১১৯৩ সালে এটি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ৮২১ বছর পর সেই নালন্দার দরজা ফের খুলেছে ২০১৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর সোমবার। মাত্র দুটি বিভাগে ১১ জন শিক্ষক ও ১৫ শিক্ষার্থী নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে নালন্দা। নালন্দাকে নিয়ে গর্ব করার অনেক কিছুই ছিল। এখানে দুই হাজার শিক্ষক ও ১০ হাজার ছাত্র ছিল। নালন্দা মূলত বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য নির্মিত হয়েছে। পরে সেখানে হিন্দু ধর্মচর্চা শুরু হয়।

এসব মত-দ্বিমত পেছনে রেখে মুসলমানরা দাবি করে, পৃথিবীতে তারাই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য দলিল-দস্তাবেজ মুসলমানদের পক্ষে। গিনেস বুকের রেকর্ড অনুসারে মরক্কোর ফেজ নগরীর কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। (http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/oldest-university)

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) বা ইউনেস্কো (UNESCO)-এর ঘোষণা মতেও কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। (A History of the University in Europe. Vol.I : Universities in the Middle Ages, Cambridge University Press, 2003, ISBN 978-0-521-54113-8, pp. 35-76 (35)

মরক্কোর ফেজ নগরীর এই প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টির ১১০০তম বর্ষপূর্তি ঘটে। এই বিশ্ববিদ্যালয় চালুর সময় ছিল ইসলামের সোনালি যুগ। নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে ফেজ নগরী ছিল অনেকটা গ্রামসদৃশ। তখন মরক্কোর শাসক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন : 'হে আল্লাহ! আপনি এ নগরীকে আইন ও বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে কবুল করুন।' সে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে ফেজ নগরীর এক বিধবা ধনাঢ্য মহীয়সী নারী চালু করেন কারাওইন মসজিদ। কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয় ৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মসজিদের অংশ হিসেবে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফাতিমা আল ফিহরি নামের এক মহীয়সী নারী। তাঁর বাবা ছিলেন ফেজ নগরীর ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মুহাম্মদ আল ফিহরি। আল ফিহরি পরিবার ফেজে আসেন নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে। তাঁরা এখানে আসেন তিউনিসিয়ার কারাওইন থেকে। সে সূত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁদের সঙ্গে কারাওইন থেকে তাঁদের সমাজের বেশ কিছু লেখক ফেজে এসে নগরীর পশ্চিমের অংশে বসবাস শুরু করেন। ফাতিমা আল ফিহরি ও তাঁর বোন মরিয়ম আল ফিহরি উভয়েই ছিলেন সুশিক্ষিত। তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে প্রচুর অর্থসম্পদ পান। ফাতিমা তাঁর অংশের সব অর্থ খরচ করেন তাঁর সমাজের লেখকদের জন্য একটি মসজিদ তৈরির পেছনে।

কেবল ইবাদতের স্থান না হয়ে এই মসজিদ শিগগিরই হয়ে ওঠে ধর্মীয় নির্দেশনা ও রাজনৈতিক আলোচনার

স্থল। মসজিদটি পুরোপুরি নির্মাণ করতে সময় লেগে যায় ২৭৮ বছর। ইতালির বোলোনায় (Bologna) যখন প্রথম ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তারও আগে কারাওইন হয়ে ওঠে এক বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। বলতে আপত্তি কোথায়, সভ্য দুনিয়াকে লেখাপড়া শিখিয়েছে মুসলমানরা! শুরুতে এটি ছিল ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। পরে সেখানে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে জাগতিক বিষয় পড়ানো শুরু করা হয়। অচিরেই এর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় আট হাজারে। তারা সেখানে চিকিৎসাবিদ্যা থেকে শুরু করে ইতিহাস-ভূগোলসহ অনেক বিষয়েই উচ্চশিক্ষা লাভ করতে থাকে। ফেজকে তখন বলা হতো 'পাশ্চাত্যের বাগদাদ'–'বাগদাদ অব দ্য ওয়েস্ট'।

ইউরোপের মহাজাগরণের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সোনালি যুগের অবসান ঘটে। মধ্য-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এসে দেখা গেল, কারাওইন ছেড়ে গেছেন জ্ঞানী-গুণী আর বিজ্ঞানীরা। সেখানে অবশেষ রইল কেবল ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা। ১৯১২-৫৬ সময়ে মরক্কো ছিল ফ্রান্সের প্রটেক্টরেট। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপের ষড়যন্ত্রের বলি হয় এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। সে সময় সেখানে পরীক্ষা ও ডিগ্রি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছাত্রদের থাকতে হয় আলোহীন-বায়ুহীন প্রকোষ্ঠে, জানালাহীন কক্ষে।

১৯৫৬ সালে মরক্কো স্বাধীন হয়। জাতিকে বিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে গড়ে তোলার দৃঢ়তা নিয়ে বাদশাহ মুহাম্মদ কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার চালু করেন গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, বিদেশি ভাষাবিষয়ক পাঠক্রম। ১৯৫৭ সালে তিনি কারাওইনে চালু করেন মহিলা শাখা। কারাওইন বিশ্ববিদ্যালয় এখন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম এক ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষাকেন্দ্র। এই বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যযুগের মুসলমান ও ইউরোপীয়দের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখে। অনেক অমুসলিমও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অমুসলিম অ্যালামনি ছিলেন ইহুদি দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ মুসা বিন মাইমুন বা মাইমোনাইডস (১১৩৫-১২০৪)। তিনি শিক্ষা লাভ করেন আবদুল আরব ইবনে মোয়াশাহার তত্ত্বাবধানে। কার্টিওগ্রাফার মুহাম্মদ ইদ্রিসির (মৃত্যু : ১১৬৬) মানচিত্র ইউরোপ অভিযানে ব্যবহার হয়েছিল রেনেসাঁর যুগে। ফেজে এ মানচিত্র দীর্ঘদিন সংরক্ষিত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করেছে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী, যাঁরা মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ইতিহাসে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইবনে রুশায়েদ আল সাবতি (মৃত্যু : ১৩২১), মুহাম্মদ ইবনে আলহাজ আল আবদারি আলফাসি (মৃত্যু : ১৩৩৬), শীর্ষস্থানীয় তাত্ত্বিক মালিকি এবং সুপরিচিত পরিব্রাজক ও লেখক লিও আফ্রিকানাস। প্রথম দিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মালেকি মাজহাব অনুসারে ইসলাম ধর্মচর্চা করা হতো। ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানকে রূপ দেওয়া হয় একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৭ সালে বাদশাহ পঞ্চম মুহাম্মদ সেখানে চালু করেন গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও বিদেশি ভাষা শিক্ষার কোর্স।

এই বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল ক্ষমতাধর সুলতানদের কাছ থেকে। প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে রয়েছে বিশ্বখ্যাত লাইব্রেরি। রয়েছে বিপুলসংখ্যক পাণ্ডুলিপি। ১৩৪৯ সালে সুলতান আবু ইনান ফ্যাবিস একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। সে লাইব্রেরিতে অসংখ্য মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রাখা হয়। আজকের দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আছে : হরিণের চামড়ার ওপর ইমাম মালেক (রহ.)-এর লেখা মুয়াত্তার পাণ্ডুলিপি, ১৬০২ সালে সুলতান আহমাদ আল মনসুরের দেওয়া কোরআনের কপি, সিরাতে ইবনে ইসহাক, ইবনে খালদুনের বই 'আল-ইবার'-এর মূল কপি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পড়ানো হতো কোরআন ও ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র), ব্যাকরণ, বক্তৃতাদানবিদ্যা বা অলংকারশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও সংগীতবিদ্যা।

মধ্যযুগে কারাওইন মুসলমান ও ইউরোপের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অগ্রনায়ন বিদ্বজ্জন ইবনে মাইমুন (১১৩৫-১২০৪), আল-ইদ্রিসি (মৃত ১১৬৬), ইবনে আরাবি (১১৬৫-১২৪০), ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৩৯৫), ইবনে খতিব, আল-বিতরুজি (অ্যালপে ট্রেজিয়াম), ইবনে হিরজিহিম ও আল ওয়্যাজ্জেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বা শিক্ষক ছিলেন। যেসব খ্রিস্টান পণ্ডিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং স্কলার ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বেলজিয়ামের নিকোলাস ক্লোনয়ার্টস ও ওলন্দাজ গোলিয়াস।

এভাবেই গোটা বিশ্বে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে মুসলমানরা।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : ই'তিকাফ

মুফতী নাসির উদ্দিন
ছাতারপাইয়্যা, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদের উত্তর পাশে মসজিদের দেয়ালের সাথে মেলানো অজুখানা, প্রস্রাবখানা, টয়লেট ও সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মসজিদ ও উল্লিখিত বস্তুগুলো একই ছাদের নিচে অবস্থিত। জানার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় মু'তাকিফ ব্যক্তি উক্ত সিঁড়ি দিয়ে প্রয়োজনে বা বিনা প্রয়োজনে ছাদে যেতে পারবে কি না? ও সেখানে অবস্থান করা যাবে কি না? এবং প্রথম তলার ছাদটা শুধু ছাদ ও ভবিষ্যতে দ্বিতলা মসজিদ বানানোর ক্ষেত্রে উভয়ের হুকুমের মাঝে কোনো ব্যবধান আসবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

উল্লিখিত মসজিদের সিঁড়ি যেহেতু মসজিদের সীমানার ভেতরে অবস্থিত বিধায় মু'তাকিফ ব্যক্তি উক্ত সিঁড়ি দিয়ে প্রয়োজনে মসজিদের ছাদে যেতে পারবে। বিনা প্রয়োজনে সেখানে যাওয়া ও অবস্থান করা মাকরূহ। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২৩৪, হিদায়া-১/২৭৫, খায়রুল ফাতাওয়া-৪/৪৪)

প্রসঙ্গ : দান

মুফতী নাসির উদ্দিন
ছাতারপাইয়্যা, নোয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মাদরাসায় বিভিন্ন লোকে কোরআন শরীফ ক্রয়ের জন্য টাকা দেয়। এটা উল্লেখ থাকে না যে এটা কিসের টাকা, মান্নতের না সাধারণ দান, এভাবে মাদরাসায় অনেক টাকা জমা হয়ে গেছে। মাদরাসায় পর্যাপ্ত পরিমাণ কোরআন শরীফ থাকায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ওই টাকা দিয়ে তাফসীরের কিতাব ও অন্যান্য ধর্মীয় কিতাব ও বই কিনতে চাচ্ছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা বৈধ হবে কি না? সঠিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি ছাড়া উক্ত টাকা দ্বারা তাফসীর বা অন্যান্য ধর্মীয় কিতাবাদী ক্রয় করা জায়েয হবে না। তাই এ ধরনের টাকা গ্রহণ করার সময় তাফসীর বা ধর্মীয় কিতাবাদী ক্রয়ের অনুমতি নিয়ে নেবে। (বাদায়েউস সানায়ে-৭/৪৪৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া-২/৫৭২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১০/১৪১)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

পেশ ইমাম, রেলওয়ে শ্রমিক কলোনি জামে মসজিদ, চাঁদপুর।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় রেলওয়ের জন্য বরাদ্দকৃত একটি পরিত্যক্ত জমি রয়েছে, সেখানে মানুষ বসবাস করে এবং এমনকি কেউ কেউ তা দখল করে বিক্রিও করে, এতে সরকার বা স্থানীয় দায়িত্ববান কোনো ব্যক্তি কোনো রকম বিধি-নিষেধও আরোপ করেনি। বর্তমানে উক্ত জমিতে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং মসজিদের সামনে দেয়ালবেষ্টিত একটি চত্বরও রয়েছে। ঈদের নামাযে মসজিদের ভেতরে কখনো মুসল্লিদের সংকুলান না হলে মসজিদের সামনে যে চত্বর রয়েছে তাতে মুসল্লিগণ নামায আদায় করেন। আমার জানার বিষয় হলো, মসজিদের সামনের উক্ত চত্বরে বিবাহের অনুষ্ঠান করা যাবে কি না?

সমাধান :

বর্তমানে বিবাহের মতো মোবারকময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের নাজায়েয কর্মকাণ্ড সমাজে পরিলক্ষিত হয়। যেমন–গায়ে হলুদ, নারী-পুরুষের অবাধে মেলামেশা, গান-বাজনা ইত্যাদি, যা থেকে বিরত থাকা সকলের জন্য আবশ্যক। প্রশ্নে বর্ণিত চত্বর মসজিদের নিকটবর্তী স্থান হওয়ার কারণে মসজিদের ন্যায় তার সম্মান ও বজায় রাখা আবশ্যক। তাই এমন স্থানে বিবাহ অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া যায় না।

অবশ্য শরীয়তসম্মত বিবাহের আকৃদ নারী-পুরুষ মেলামেশা ছাড়া অলিমার খাবারদাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন এমন কাজের কারণে কোনো মুসল্লির যাতায়াতে বা নামাযে ব্যাঘাত না হয়। (সূরা হজ-৩২, ফাতহুল কুদির-৩/১০৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া-২/৬৫৯-৬৬০)

প্রসঙ্গ : ওয়াক্‌ফ

মাওলানা রেজাউল করিম
চকরিয়া, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

মাদরাসা ও হিফজ বিভাগ একসঙ্গে এটেস্ট এবং হিফজ বিভাগ মাদরাসার আওতাধীন, বর্তমানে হিফজ বিভাগ মাদরাসার ভূমিতে অবস্থিত। তবে শুধু হিফজ বিভাগের নামে বেশ কিছু ভূমি ওয়াক্‌ফকৃত যেগুলোর ব্যয়ে হিফজ বিভাগের খরচ বাদে আরো অনেক অতিরিক্ত সম্পদ অবশিষ্ট থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে ভূমিগুলো হিফজ বিভাগের নামে ওয়াক্‌ফকৃত তার খরচ বাদে অবশিষ্ট সম্পদগুলো মাদরাসার কাজে ব্যয় করা বৈধ হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত হিফজ বিভাগ এবং মাদরাসা যেহেতু অভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং হিফজ বিভাগ মাদরাসারই অংশ, তাই হিফজ বিভাগের অতিরিক্ত সম্পদ উক্ত মাদরাসার কাজে ব্যয় করা বৈধ হবে। (মাজমাউল আনহুর-২/৫৯৬, ফাতাওয়ায়ে কাসেমিয়া-১২/১৭৫, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-২/১৮৭)

প্রসঙ্গ : খেলাধুলা

মুহাম্মদ সোহাইল
বসুন্ধরা, আ/এ, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

খেলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে কি না? এবং খেলাধুলা দেখা যাবে কি না? এ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের আলোকে ফতোয়া জানালে খুব ভালো হয়।

সমাধান :

আমাদের দেশে প্রচলিত ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলাধুলাতে শরীয়তের খেলাফ বিভিন্ন কার্যকলাপ তথা হার-জিত, সতর খোলা অন্যের সতর দেখা, নামায বা জামা'আতের পাবন্দি না থাকা ইত্যাদি কারণে শরীয়তসম্মত নয়। তাই এগুলোকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা এবং দেখা শরীয়তসম্মত নয়। (আহকামুল কোরআন-৩/১৮৫, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৫/৩৬৪, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-১৬/২৮৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাওলানা আবুল হোসেন
রাজীবপুর, সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

আমার দাদা মৃত্যুর আগে তিন শতক জমি মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করে, পরে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, এরপর দাদা মৃতুর পূর্বে ওয়াসিয়্যাত করে যান, যে আমার মৃত্যুর পর মসজিদের মেহরাবের পার্শ্বে কবরও দিও। সেই অনুযায়ী মৃত্যুর পরে মেহরাবের এক পার্শ্বে মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে কবর দেওয়া হয়। পরে দ্বিতীয়বার মসজিদ নির্মাণের সময় কবরটি মসজিদের ভিমের নিচে পড়ে যায় এবং মসজিদের পিলার খননের সময় মাইয়্যাতের কাফনের কাপড় দেখা যায়, যার দ্বারা বোঝা যায় যে মাইয়্যাত এখনো স্বঅবস্থায় আছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো– (ক) উক্ত মাইয়্যাতকে সামনে রেখে নামায হবে কি না? (খ) পুরাতন কবরের ওপর মসজিদ বানানো যাবে কি না?

সমাধান :

হ্যাঁ, নামায সহীহ হবে। তবে মসজিদের জন্য জায়গা ওয়াক্‌ফ করার পর এতে ওয়াক্‌ফকারীর দাফনের ওসিয়্যাত করে যাওয়া সহীহ হয়নি। তাই এর ওপর মসজিদ নির্মাণ করতে কোনো আপত্তি নেই। (তিরমিযী শরীফ-১/৭৩, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৪/৩৭৫, খায়রুল ফাতাওয়া-৩/৪২৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়

হাফেজ আতাউর রহমান
নাঙ্গলকোর্ট, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের গ্রামের মসজিদে মানুষজন হাঁস, মুরগি, ডিম, নারিকেল ইত্যাদি দান করে। তারপর যখন শুক্রবার আসে মসজিদের মুতাওয়াল্লি জুমু'আর নামাযের পর ওই দানকৃত মালগুলো নিলামে তুলে বিক্রি করেন, যাতে করে মসজিদের ফায়দা হয় এবং যখন নিলামে তোলে তখন মানুষজন মসজিদে হৈ-হুল্লোড় শুরু করে। যার কারণে মসজিদের আদব রক্ষা হয় না। ইমাম সাহেব তাদের নিষেধ করলেন মসজিদে বিক্রি করা থেকে। মানুষজন জানতে চাইল মসজিদে ক্রয়-বিক্রি জায়েয আছে কি না? এ ব্যাপারে শরয়ী সমাধান কী?

সমাধান :

মসজিদে কোনো বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ; যদিও তা মসজিদের সামান হয়। তাই মসজিদের আদব রক্ষার্থে বাহিরে ক্রয়-বিক্রয় করা জরুরি। (নাসাঈ শরীফ-৮১৫, হিদায়া-১/২৩০, আহসানুল ফাতাওয়া-৬/৪৪২)

প্রসঙ্গ : ইসলামী সংগীত

ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ
রায়পুরা, নরসিংদী।

জিজ্ঞাসা :

আমরা ঈদ উৎসব হিসেবে এলাকার যুবকদের নিয়ে একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। এতে আমরা মিউজিক (বক্স) লাইটিং ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। যাতে করে যুবকশ্রেণী অপসংস্কৃতি যেমন–পিকনিক, গান, বাদ্য, নাচ-গান ইত্যাদি নিয়ে মেতে না ওঠে। কিন্তু এই অনুষ্ঠান করায় আমরা

অনেক আলেমের সমালোচনার পাত্র হই। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কেমন? ইসলাম কি একেবারেই সমর্থন করে না? আর যদি সমর্থন করে তাহলে এটা কীরূপ? দলিলসহ সবিস্তারে বর্ণনার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমাধান :

বর্তমান ইসলামী সংগীতশিল্পীদের প্রচলিত ইসলামী সংগীতের সুর কণ্ঠ, আওয়াজের তরঙ্গ, মিউজিক, ভঙ্গিমা ইত্যাদি সকল বিষয় আধুনিক গানের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এ ছাড়া তাতে আরো বহু শরীয়ত গর্হিত কর্মকাণ্ড পাওয়া যায়। অতএব তা জায়েয হতে পারে না। (সূরা বনী ইসরাঈল-৬৪, আহকামুল কোরআন-৩/৩০২, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/৩৫২)

প্রসঙ্গ : ঘুষ

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
লক্ষ্মীপুর।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমান সময়ে সরকারি হোক বা বেসরকারি, যেকোনো ডিপার্টমেন্টে চাকরি নেওয়ার জন্য ঘুষ দিতে হয়। নতুবা চাকরি হয় না। তাই আমার মতো সুশিক্ষিত ব্যক্তির জীবিকা নির্বাহের জন্য ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া বৈধ হবে কি না? আর উক্ত চাকরির বেতন গ্রহণ করা আমার জন্য হালাল হবে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে ঘুষের লেনদেন সম্পূর্ণভাবে হারাম। তাই ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না। তবে যোগ্যতা থাকা ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সে উক্ত চাকরির হকদার হওয়া সত্ত্বেও যদি ঘুষ দেওয়া ছাড়া উক্ত চাকরি না পাওয়া যায় এবং জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো মাধ্যমও না থাকে তাহলে ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়ার অনুমতি থাকলেও ঘুষগ্রহীতার জন্য তা গ্রহণ করার অনুমতি নেই। সর্বাবস্থায় নির্ধারিত কাজের যোগ্যতা থাকলে এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে তার জন্য বেতন-ভাতা গ্রহণ করা হালাল হবে। (তিরমিযী শরীফ-৪২৫, মিরকাতুল মাফাতিহ-৭/২৯৫, কাওয়াইদুল ফিকাহ-৬০)

প্রসঙ্গ : বিবাহ

মুহাম্মদ ফয়েজ মোল্লা
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি মোহাম্মদ ফয়েজ মোল্লা, আমি একটি মেয়েকে এভাবে বিয়ে করি যে, মেয়ের মোবাইলে ফোন দিয়ে দুজনকে শুনিয়ে একজনকে উকিল নিযুক্ত করি। মেয়ে বলল, আমি আমার নিজেকে মহরে ফাতেমীর বিনিময়ে ফয়েজ মোল্লার কাছে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আপনাকে উকিল বানালাম। তারপর উকিল সাহেব দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে আমাদের বিয়ে পড়িয়ে দেন। জানার বিষয় হলো, উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে কি?

সমাধান :

প্রশ্নে উল্লিখিত উকিল সাহেব কনের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যদি শরীয়তসম্মত সাক্ষীর সামনে বরকে এভাবে প্রস্তাব করে থাকে যে, আমার মক্কেলের বিবাহ মহরে ফাতেমীর বিনিময়ে আপনার সাথে করে দিলাম এবং একই মজলিসে উক্ত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বর ওই প্রস্তাব কবুল করে থাকে তাহলে উক্ত বিবাহ শরীয়তের দৃষ্টিতে সহীহ হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২৬৮, ফাতাওয়ায়ে তাতারিখানিয়া-৪/১৪৬, খায়রুল ফাতাওয়া-৪/৩৬৯)

প্রসঙ্গ : জায়েয-নাজায়েয

মুহাম্মদ সোহাইল আহমদ
কলিয়ার চর, বামদী।

জিজ্ঞাসা :

গরুর গোয়ালঘর এমনভাবে বানানো হয়েছে যে গরুর প্রস্রাব-পায়খানা কেবলার দিকে পতিত হয়। জানার বিষয় হলো, এভাবে গোয়ালঘর বানানোর কারণে কেবলার সম্মানহানি হবে কি না? এবং এভাবে গোয়ালঘর বানানো জায়েয হয়েছে কি না?

সমাধান :

এভাবে গোয়ালঘর বানানোর কারণে কেবলার সম্মানহানি হবে না এবং এভাবে গোয়ালঘর বানানোকে অবৈধ বলা যাবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের গোয়ালঘর বানানো উচিত নয়। (সূরা হজ-৩২, মুসলিম শরীফ-১/২০৭, তিরমিযী শরীফ-১৪)

প্রসঙ্গ : মেশিনে মুরগি জবাই

মাওলানা ওমর ফারুক
শ্রীপুর, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমানে মেশিনে যে মুরগি জবাই করা হয় তা খাওয়ার হুকুম কী? জায়েয না হলে জায়েয হওয়ার কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

সমাধান :

মুসলমান ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পড়ে নিজের শক্তিতে ধারালো ছুরি দিয়ে নির্দিষ্ট রগ কেটে জবাই করার পর অবশিষ্ট কাজ মেশিনে করা হলে উক্ত প্রাণী হালাল বলে গণ্য হবে, অন্যথায় নয়। (কুদুরী-৬১৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৫/২৮৬, আপকে মাসায়েল আউর উনকা হল-৫/৪৫২)